শাশ্বত ভারত গ্রন্থমালা

নবজাগরণে ডিরোজিও

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

অমৃত শরণ

প্রকাশক ঃ আদ্যনাথ বসু ॥ **অমৃত শরণ প্রকাশন**
বিদ্যাসাগর রোড ॥ নবপল্লী ॥ উত্তর ২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০

প্রচ্ছদ—গণেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ মিণ্টু সাহা ঃ মি-মেণ্টো প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৮, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন ॥ কলকাতা—১১

উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ—অপূর্ব কান্তি মজুমদার

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থরশ্মি ঃ ২০৬ বিধান সরণী ॥ কলকাতা-৬
পুস্তক বিপণি ঃ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা-৯

উৎসর্গ

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির

একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক

সুহাস মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"পবিত্র ধর্মমণ্ডলীর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে এই ভ্রান্ত মত ত্যাগ করছি যে সূর্যই কেন্দ্র এবং নিশ্চল। এই ভ্রান্ত মতবাদ কোনওভাবে পোষণ, সমর্থন বা প্রচার না করতে আদিষ্ট হয়ে আমি এইসব ভ্রম ও ধর্মবিরোধী মত এবং ধর্মমণ্ডলী বিরোধী অন্যসব মত ও ভ্রমকে শপথপূর্বক পরিত্যাগ করছি এবং এগুলির প্রতি শাপ ও বিদ্বেষ ঘোষণা করছি…।"

খৃষ্টীয় ধর্মমণ্ডলী গ্যালিলিওকে উপরোক্ত বিবৃতিটি দিতে বাধ্য করেছিল।

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের
পরবর্তী নিবেদন
নবরূপে তিতুমীর

প্রবেশিকা

কার্ল মার্কস 1853 খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন, Arabs, Turks, Tartars, Moguls, who had successively overrun India soon became Hinduized, the barbarian conquerodrs being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects.

আমরা কার্ল মার্কস বর্ণিত সেই উন্নত হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ভারতভূমিতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি চিরন্তন হয়ে থাকুক, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আমরা একজন হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরেশীয় নেতা হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর চরিত্রালোচনায় ব্রতী হয়েছি।

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—তখনকার দিনে তাঁদের বলা হতো ইউরেশীয়ান বা ইষ্টইণ্ডিয়ান; বৃটীশ আমলে এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। তাঁরা নিজেদের দেশীয়দের থেকে উচ্চস্তরের জীব বলেই ভাবতেন। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশের দশকেও প্রচুর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দেখা যেত কলকাতার পথে ঘাটে, ট্রামে-বাসে-ট্রেনে। বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে, রেলকোম্পানীগুলিতে চাকুরীরত ছিলেন ওইসব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা। বর্তমানে তাঁরা প্রায় বিলুপ্ত প্রাণীর পর্যায়ে। উন্নততর জীবনযাত্রার লোভে চলে গেছেন অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডায়।

এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের একজন হয়েও ডিরোজিও হঠাৎ কেন হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন, সেই প্রশ্নই জেগেছিল আমাদের মনে। তিনি তো নিজের জাতিসত্তা বিসর্জন দিয়ে শংকর গুহনিয়োগীর মত ছত্রিশগড়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যাপৃত হননি। বা, ডেভিড হেয়ারের মত ব্যবসাপত্র বিক্রী করে দিয়ে হিন্দুবালকদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বজাতিদের কাছ থেকে আধাহিন্দু বদনাম কেনেননি। ইতিহাস বলে ডিরোজিও তাঁর ইউরেশীয় সত্তা মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেননি। তিনি সরাসরি ইউরেশীয় রাজনীতি করতেন। ইউরেশীয়

সমাজের সমস্যাবলী তুলে ধরার জন্য দুটি পত্রিকাও চালিয়েছিলেন ঃ Kaleidoscope এবং East Indian. ডেভিড হেয়ার খৃষ্টীয় কবরখানা না পেলেও ডিরোজিও যথারীতি শায়িত আছেন খৃষ্টীয় কবরখানাতে। সুতরাং সুরু হলো আমাদের অনুসন্ধান।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডিরোজিও নিয়ে তেমনভাবে চর্চা হয়নি। তবে ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র ডেভিড হেয়ারের জীবনী রচনা করতে গিয়ে শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। কিন্তু শিষ্যদের কেউই গুরুর পূর্ণ জীবনী রচনা করেননি। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' এ ডিরোজিওর কথা কিছু লিখেছেন। সেখানে শিক্ষক ডিরোজিওর যথেষ্ট প্রশংসা থাকলেও ডিরোজিও শিষ্যদের হিন্দুত্ববিরোধী কার্যকলাপ যে গুরুর শিক্ষারই অবদান, সেকথা অনুচ্চারিত থাকেনি। ডিরোজিওর পূর্ণ জীবনী প্রথম রচনা করেন ইংরেজ টমাস এডওয়ার্ডস 1884 খৃষ্টাব্দে। এডওয়ার্ডস ডিরোজিওকে মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের পূর্বসূরী রূপেই চিহ্নিত করেন। এডওয়ার্ডসের বক্তব্য, ডিরোজিও হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের যুবকদের হিন্দুত্ব বিরোধী করে তোলার পরিণামেই আলেকজাণ্ডার ডাফের পক্ষে ওইসব যুবককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজ সহজ হয়েছিল। ডিরোজিওর পরবর্তী জীবনীকার ওয়াল্টার ম্যাজও তাঁর ক্ষুদ্র পুস্তকে ডিরোজিওর আস্তিকতা ও হিন্দুত্ববিরোধী কার্যকলাপ স্বীকার করেছেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যগণ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন। কিন্তু তিনি রাজনারায়ণ বসু থেকে খুব দূরবর্তী নন। এই গ্রন্থে দেখা যায় তিনি ডিরোজিও-শিষ্যদের আস্তিকতা প্রতিপন্ন করতে যত্নবান। শিবনাথ শাস্ত্রী অধিকন্তু জানিয়েছেন, ডিরোজিও-শিষ্যরা মেকলের উগ্র সমর্থক ছিলেন। মেকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডিরোজিও-শিষ্যরাও স্লোগান দিতেন, এক সেলফ ইউরোপীয় সাহিত্যে যা আছে গোটা সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্যে তা নেই। যদিও মেকলের মত ডিরোজিও শিষ্যরাও সমসময়ে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ছিলেন দারুণ অজ্ঞ।

ডিরোজিও সম্বন্ধে নতুন ভাবনাচিন্তা দেখা গেল বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকে, যখন বিনয় ঘোষ প্রকাশ করলেন 'বিদ্রোহী ডিরোজিও'। নানা অপ্রামাণিক কথায় পরিপূর্ণ এই ডিরোজিও জীবনী। যেমন, ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ডের নাস্তিকতা, ড্রামণ্ডের কবিতা সংকলন প্রকাশ, ডিরোজিওর মৃত্যু-তারিখ, ইত্যাদি। সুরেশ চন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, বিনয় ঘোষ ইতিহাস ও রম্যরচনার

পার্থক্যটি অবাঞ্ছিত মনে করতেন[0.1]।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই রম্য নয়। বিনয় ঘোষ মহেশচন্দ্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, ডিরোজিও নাকি শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন, "ধর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কি তা আজও আমি জানিনা। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি এখনও।"

মহেশচন্দ্রের মুখ থেকে এ হেন উক্তি কোন্ সূত্রে পেলেন বিনয় ঘোষ? এ উক্তি অপ্রামাণিক, কল্পিত।

ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস লিখেছেন, মহেশচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করেন, শেষ সময়ে ডিরোজিও ঈশ্বরের নামে কোনও শপথবাক্য উচ্চারণ করেননি। কোনও রূপ আস্থা প্রকাশ করেননি খৃষ্ট মতের প্রতি। মহেশচন্দ্র ঘোষের উক্তির উৎস এডওয়ার্ডস আমাদের জানাননি। মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এডওয়ার্ডস ডিরোজিও-জীবনী রচনা করেন। সুতরাং এডওয়ার্ডসের বক্তব্য অপ্রামাণিক।

মহেশচন্দ্রের উক্তির বিষয়ে আবার সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন, "সেই খৃষ্টান মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন..."কোথায় লিখেছেন তা আর বলেননি মৈত্র মহাশয়। অথচ উনি সচরাচর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন। সুতরাং সুরেশচন্দ্রের বক্তব্যও অপ্রামাণিক।

এডওর্য়াডস মহেশচন্দ্র ঘোষের সাক্ষ্যের বাক্যটি শেষ করেছিলেন এইভাবে, "but that Derozio died as he had lived, searching for truth"

উপরোক্ত বাক্যাংশটিকেই ঘুরিয়ে ডিরোজিওর মুখে বসিয়ে দিয়ে এক ডিরোজিও-উপাসনা সৃষ্টি করেছেন বিনয় ঘোষ। পরবর্তীকালে নাটকে চলচ্চিত্রে বিনয় ঘোষের ডায়ালগ ডিরোজিওর মুখে বসিয়ে বাজার মাত করেছেন লক্কড়মার্কা হিন্দী সিনেমার অভিনেতা cum নাটক-চলচ্চিত্রকার। নিখিল সরকার[0.2] বিনয় ঘোষের কথাই ব্যবহার করেছেন মহেশচন্দ্রের দোহাই দিয়ে। পান্থজন ভ্রমন করতে করতে কোন পথে যে মহেশচন্দ্রের মুখে এ হেন কথা শুনলেন তা জানা যাচ্ছে না।

বিনয় ঘোষের মহিমা আরও আছে; হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগকালীন ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসনকে যে চিঠি লিখেছিলেন ডিরোজিও, তার বয়ান অন্তত চারটি গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। সেই চিঠিতে, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের আস্তিকতা প্রতিপন্ন করতে ডিরোজিও দুটি বাক্য ব্যবহার করেছিলেন ঃ

"I have never denied the existence of God in the hearing

of any human being" এবং "Had my religion and morals being investigated by them, they could have no ground to proceed against me."

বিনয় ঘোষ প্রথমটির বিকৃত অনুবাদ করেছেন আর দ্বিতীয়টি বাদ দিয়েছেন তাঁর 'সম্পূর্ণ উদধৃত' চিঠি থেকে। শুধু তাই নয়, চিঠির মধ্যে যথেচ্ছ ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিজের কথাঃ "পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়ে মানুষ হওয়া শ্রেয়।" ইত্যাদি।

এইসব স্বকপোল উৎসারিত বাক্য ডিরোজিওর চিঠিতে মিশ্রিত করা পাঠকের সঙ্গে তঞ্চকতা করা ছাড়া কিছুই নয়।

ডিরোজিওর চিঠির উপরিউক্ত বাক্যদুটি অস্বীকার করে আরও যাঁরা ডিরোজিওকে নাস্তিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তাঁরা হলেন সুশোভন চন্দ্র সরকার,[0.3] পল্লব সেনগুপ্ত,[0.4] কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য,[0.5] যোগেশ চন্দ্র বাগল[0.6]। যোগেশ চন্দ্র বাগল লিখেছেন, "এডওয়ার্ডস লিখিয়াছেন, ডিরোজিও ছিলেন একান্তভাবে সত্যসন্ধানী। তিনি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না।" কিন্তু এডওয়ার্ডস স্পষ্টভাবেই লিখেছেন, "Derozio lived in the faith and spirit of Christ as he understood that faith and life, and in no other faith could he live or die."

সুতরাং বাগল মহাশয় তথ্য গোপন করে গেছেন।

সুশোভন চন্দ্র সরকার আরও কিছু মহৎ কাজ করেছেন। ডিরোজিওর পদচ্যুতি সংক্রান্ত হিন্দু কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর সভা নিয়ে উনি যে প্রবন্ধ প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে[4.36] প্রকাশ করেছিলেন তাতে স্মারকলিপির 8নং দফা বাদ দিয়েছিলেন। সুবীর রায়চৌধুরী[0.7] লিখেছেন ভুল করে 7 এর পর ক্রমিক সংখ্যা আছে 9. বিনয় ঘোষ লিখেছেন 8নং দফা কলেজের কার্যবিবরণীতে নেই। কিন্তু সুরেশচন্দ্র মৈত্র এবং যোগেশ চন্দ্র বাগল কলেজের "হস্তলিখিত কার্যবিবরণী থেকে" 8নং দফা একটা দেখিয়েছেন। স্মারকলিপিতে 8নং দফা না থাকাটা অস্বাভাবিক। ভুলক্রমে বাদ গেলেও দফাওয়ারী আলোচনার সময় সেটি নিশ্চয় সংশোধিত হতো। সুতরাং অধ্যাপক সরকার 8নং দফা বাদই দিয়েছিলেন। উনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন, ঐতিহাসিকেরা ইচ্ছামত তথ্য গ্রহন-বর্জন করতে পারেন।

সুরেশ চন্দ্র মৈত্র ডিরোজিও লিখিত Education in India প্রবন্ধ থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উৎকলিত করেছেন [0.8]ঃ

"I was born in India and I have been bred here; I am proud

to acknowledge my country, and do my best in her service; even love of my country shall not hinder me from expressing what I believe to be right." তারপর মৈত্র মহাশয় উদ্ধৃতির শেষ অংশের বাংলা অনুবাদ করছেন ঃ "দেশের কল্যাণে দরকার হলে অপ্রিয় সত্য বলব।"

মৈত্র মহাশয় ইংরেজী জানেন না, এটা তো বিশ্বাস যোগ্য নয়। সুতরাং ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে ডিরোজিওর স্বার্থপর ইউরেশীয় চরিত্রকে আড়াল করার জন্যই তিনি বিকৃত অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটা এক ধরনের অস্বীকারবাদ (negationism)। লেখাপড়া শেখানোর জন্য ভাইকে বিলেত পাঠানোর সাফাই গাইতেই, অতি অল্পবয়স্ক ডিরোজিও কথাগুলি লিখেছিলেন। ভাই-এর ঐহিক উন্নতিই তখন দাদার লক্ষ্য—সেইটাই সত্য। সুতরাং তা দেশপ্রেমের থেকে বড়।

সুরেশচন্দ্র মৈত্রের অস্বীকারবাদের আরও নজির আছে। ডিরোজিও 1829-30 খৃষ্টাব্দে Kaleidoscope নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত Kaleidoscope পত্রিকার ফাইল থেকে নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধ সংকলিত করেছেন Bengal ঃ Early Nineteenth Century গ্রন্থে। গৌতম চট্টোপাধ্যায় ডিরোজিওকেই Kaleidoscope-এর সম্পাদক বলে ঘোষণা করেছেন। পত্রিকার উদ্বোধনী সম্পাদকীয় কবিতাতেই লেখা। Kaleidoscope-এর বক্তব্যের সঙ্গে ডিরোজিও শিষ্যদের বক্তব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। পত্রিকার ভাবনা-চিন্তাতেও ইউরেশীয় মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু পত্রিকাটির বেশ কিছু বক্তব্য অসুবিধাজনক বোধ হওয়াতে মৈত্র মহাশয় ডিরোজিওকে সম্পাদকত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে উৎসুক। তিনি তাঁর পুস্তকের ভূমিকাতে লিখেছেন, "সম্ভবতঃ হিন্দু কলেজের চাকরীর জন্য তিনি এর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন না।" সম্ভবত দিয়ে কোনও সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না। তিনি Kaleidoscope এর মুদ্রাকর হিসাবে P. S. Derozario এই নাম লিখেছেন। পরে গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে লিখেছেন, হেনরী ও P. S. Derozario এক ব্যক্তি নন। গৌতম চট্টোপাধ্যায় কদাচ বলেননি ডিরোজিও Kaleidoscope এর মুদ্রাকর। পুস্তকের অন্যত্রও তিনি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। মৈত্র মহাশয়ের ক্ষোভের কারণ, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করেছেন।

টমাস এডওয়ার্ডস-ই ডিরোজিওকে মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের পূর্বসূরী রূপে চিহ্নিত করে গেছেন। আমরা নতুন কিছু উচ্চারণ করছি না। উপযুক্ত

পটভূমিকায় তথ্য প্রমাণ সহযোগে স্থাপন করছি ডিরোজিওকে। এর জন্য খৃষ্টধর্ম ও ভারতে খৃষ্টান মিশনারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বলা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে অরবিন্দ দে প্রকাশিত নবসন্ধি বাইবেল। এবং তা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রামাণ্য ইংরেজী বাইবেলের সঙ্গে। একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোরাণের প্রকাশক হরফ প্রকাশনী।

ডিরোজিও যুক্তিবাদের ছদ্মবেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী। কারণ "এরকম মন্তব্যে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের অভিযোগের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এডওয়ার্ডস জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই ভুলই করেছেন"[0.9]। অর্থাৎ, সুবীরবাবুর মতে সত্য তার নিজগুণে সত্য বলে প্রতিপন্ন হবে না। কে উচ্চারণ করছে বা কে সমর্থন করছে তার উপরই নির্ভর করবে। ঘৃণ্য রাধাকান্ত দেব যদি বলেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, তবে তা মিথ্যা হতে বাধ্য!

তবুও অকালপ্রয়াত সুবীর রায়চৌধুরীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর 'হেনরী ডিরোজিও' এতাবৎকাল প্রকাশিত ডিরোজিও জীবনীর মধ্যে সবচেয়ে তথ্যনিষ্ঠ। মুখ্যতঃ তাঁর ডিরোজিও জীবনী খুঁটিয়ে পড়েই আমাদের সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছে, ডিরোজিও ডাফের পূর্বসূরী। তিনিই আমাদের জানিয়েছেন, ডিরোজিও খৃষ্টীয় কবরখানা পেলেও তা পাননি ডিরোজিওর সহপাঠী প্রখ্যাত চিত্রকর চার্লস পোট। তিনিই তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন, ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ড্রামণ্ড ছিলেন রীতিমত আস্তিক। বস্তুতঃ তাঁর পুস্তকে সন্নিবিষ্ট যাবতীয় তথ্য তাঁর মূল বক্তব্যের বিরোধিতাই করে।

একজন মানুষের ধর্ম তার ধর্মীয় আচার আচরণের উপর নির্ভরশীল নয়। জগৎকে সে কী দৃষ্টিতে দেখছে, তারই ওপর নির্ভর করে তার ধর্মীয় সত্তা। ডিরোজিও হিন্দুদের দেখেছেন একজন খৃষ্টানের চোখেই। জেন্টু[0.10] হিন্দুরা তাদের পৌত্তলিকতা সমেত অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় মনে হয়েছে ডিরোজিওর চোখে। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে একটি কথাও কোথাও উচ্চারণ করেননি তিনি। কারণ সম সময়ে একজন ইউরেশীয়ের চোখে খৃষ্টধর্ম ছিল চন্দ্রসূর্যের অস্তিত্বের মতই সর্বসত্য। ডিরোজিও সারাজীবনে একটি রবিবারেও গীর্জায় না গেলে কিছু আসে যায় না। খৃষ্টানসুলভ জেণ্টু বিদ্বেষই খৃষ্টান ডিরোজিওকে চিনিয়ে দিতে যথেষ্ট। এই জেণ্টু বিদ্বেষ একেবারেই ছিল না বিশুদ্ধ নাস্তিক মানবতাবাদী ডেভিড হেয়ারের মধ্যে।

এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে অজস্র মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সবার কাছে লিখিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অবসর নেই। তাঁদের জন্যে রইলো আমাদের

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তবুও কয়েকজনের নাম না বললেই নয়। এঁরা হলেন, ডঃ স্বপন বসু, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক সুহাস মজুমদার, ডঃ জগন্নাথ ঘোষ, ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবকুমার বসু, শ্রীশ্যামলেন্দু বাগচী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী এবং ডাঃ অনুভা চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তক পাঠ করে বঙ্গবাসীগণ তাঁদের অধিষ্ঠানভূমি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে আমাদের শ্রম সার্থকতা লাভ করবে।

বিনীত
গ্রন্থকার

-

১০ খৃষ্টধর্ম ও ভারতে খৃষ্টান মিশনারী

সেমীয় খৃষ্টধর্মের বয়স প্রায় দুহাজার বছর। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী প্রাচীন মানুষের সভ্যতা। পাশব পর্যায় পার হয়ে মানুষ কবে সচেতন হলো তা সঠিকভাবে জানা নেই। কিন্তু মানুষ সচেতন হয়েই পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করলো। হয়তো দুর্দম প্রকৃতি, হিংস্র বন্যজন্তু, বিষাক্ত সরিসৃপ, রোগ-ভোগ ইত্যাদি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যখন পৃথিবীর সর্বত্রব্যাপী তখন এর সমাজমনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাচীন মানুষেরা নিরাকার একেশ্বরবাদী ছিল না ঃ তারা প্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর অনুসন্ধান করতো--যে ঈশ্বর তাদের সবরকম দুঃখ ও অসহায়তা থেকে মুক্তি দেবে। পরবর্তী যুগে মানুষ ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ কল্পনা করেছে। সেই রূপ অনুযায়ী প্রতিমা নির্মাণ করে সুরু করেছে পূজা করতে। সেই প্রতিমাপূজা আজও অব্যাহত।

এইসব প্রতিমাপূজক বা প্রকৃতিপূজকরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়, এই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রতিমাপূজা বা প্রকৃতিপূজাকে কেন্দ্র করে কোনও ব্যাপক নরহত্যা বা মানবতাবিরোধী কাজকর্ম সংগঠিত হয়েছে, এমন নজির পাওয়া যায় না। কোনও কোনও প্রতিমাপূজকরা কালেভদ্রে নরবলি দিত (বা এখনও দেয়) দেবতার তুষ্টির জন্য, ইতিহাস চর্চার ফলে এইটুকু মাত্র জানা গেছে।

সেমীয় একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের প্রবর্তকরা পয়গম্বর নামে অভিহিত হন। 'পয়গম্বর' শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বর প্রেরিত দূত।' বঙ্গ-বিদুষী বেগম রোকেয়ার ভাষায়, "পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"[1·1]

এই সেমীয় প্রেরিতদূতদের উদ্ভাস পশ্চিম এশিয়ায় মূর্ত্তিপূজকদের দেশে। সুতরাং দৈবী ক্ষমতা আত্মসাৎ করার জন্য মূর্তিপূজার বিরুদ্ধাচারণ করা তাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হলো। তাঁরা প্রচার করলেন মূর্ত্তিপূজা ঘৃণ্য। মূর্ত্তিপূজকদের সবরকম অপরাধীদের সঙ্গে একই বন্ধনীভুক্ত করা হলো। বাইবেলে আছে ঃ রক্তমাংসের চাহিদাগুলি স্পষ্ট ঃ ব্যাভিচার, অপবিত্রতা,

চরিত্রহীনতা, পৌত্তলিকতা, ভোজবিদ্যা, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, ক্রোধ, স্বার্থপরতা বিবাদ, দলবিভেদ, মত্ততা, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং এই জাতীয় সব। যারা এইসব কাজ করে তারা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না।[1.2]

সুতরাং নিরীহ মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে অকারণেই ঘৃণার খড়্গ নেমে এলো। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতবাদের প্রচারকেরা চিরকাল এই ভাবেই লোকের 'ভাল' করার জন্যই নিজের মত অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। সেই 'ভাল' করার মানসিকতার মধ্যেই সুপ্ত থাকে নিজের স্বার্থবুদ্ধি। এতে বিঘ্নিত হয় মানুষের স্বাধীনতা, ইচ্ছামত জীবন যাপনের অধিকার।[1.3] সেমীয় ধর্মের প্রবর্তকরাও এর ব্যতিক্রম নন।

যেহেতু মূর্তিপূজক বা প্রকৃতিপূজকদের ধর্ম স্বতঃজাত, সেহেতু ওইসব ধর্মে ধর্মান্তরকরণের কোনও তত্ত্ব বা প্রক্রিয়া নেই। কিন্তু প্রচারকামী সেমীয় ধর্মসমূহ সম্প্রসারণবাদী। গোটা বিশ্বজুড়ে সেমীয় ঈশ্বরের রাজ্যপ্রতিষ্ঠাই ওইসব ধর্মের চরম উদ্দেশ্য।[1.4] [1.5] সেজন্য ওইসব ধর্মসমূহ এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদও বটে।

বর্তমানে সাধারণ বঙ্গসন্তানদের খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যিশুর জীবনের কিছু ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় সকলেরই জানা। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, ফাদার ফরগিভ দেম, দে নো নাথ হোয়াট দে ডাথ— হত্যাকারীদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছে যিশুর এই প্রার্থনা, বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ মনে এক মহান চিত্র চিরকালের জন্য অঙ্কিত করে রেখেছে। বাইবেলের কিছু গসপেল বা সুসমাচার টুকরো টুকরো ভাবে জানা আছে প্রতিটি বাঙালীর। প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস—এই বাক্যটিকেই খৃষ্টধর্মের সারকথা বলে জানে তারা।

কিন্তু যিশুর জীবন আর খৃষ্টধর্ম এক নয়। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গসপেল খৃষ্টধর্মের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূর্তিপূজক হিন্দুদের সঙ্গে খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বন্দ্ব। সুতরাং বঙ্গ ইতিহাসের সেই পর্যায়ের সঠিক মূল্যায়ণের প্রয়াসে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

খৃষ্টধর্ম: মূল বিশ্বাস[1.6]

বর্তমান পৃথিবীর খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা বহুধা-বিভক্ত। প্রতিটি ধর্মমণ্ডলীর আচার-বিচার ও বিধান ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কিন্তু খৃষ্টধর্মের মূল যে বিশ্বাস (Dogma) সবাই সত্য বলে মনে করেন, সেগুলো হলো:

(১) **যিহোভার বচন ঃ** ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও নিউ টেষ্টামেণ্ট হলো ঈশ্বর যিহোভার বচন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে বিভিন্ন পয়গম্বরদের মাধ্যমে যিহোভা তার 'মনোনীত মানুষ' ইহুদীদের বচন দান করেছেন। কিন্তু নিউ টেষ্টামেণ্টের বচন সমগ্র মানবজাতির জন্য। এখানে ঈশ্বরের মুখপাত্র তাঁর পুত্র যিশু এবং তাঁর প্রধান শিষ্যগণ। সুতরাং খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সমস্ত বচন আদতে ঈশ্বর যিহোভার। ঈশ্বরের বচন স্বাভাবিক ভাবেই ত্রুটিশূন্য এবং সে কারণে প্রশ্নযোগ্য নয়। দুটি টেষ্টামেণ্ট সম্বলিত বাইবেল খৃষ্টীয় বিশ্বাস ও ধর্মকর্মের আকর হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলঙ্ঘণীয়।

(২) **আদিম পাপ ঃ** ওল্ড টেষ্টামেণ্ট অনুযায়ী মানুষের আদিম পিতা ও মাতা হলেন আদম ও ঈভ। তারা দুজনে স্বচ্ছন্দেই স্বর্গে বাস করছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তারা যিহোভার নির্দেশ অমান্য করে স্বর্গোদ্যান থেকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল পেড়ে খেয়ে ছিলেন। এর ফলে তাঁরা যিহোভার বিদ্বেষের পাত্র হন ; কিন্তু সৃষ্টি করেন মানবজাতির। যেহেতু যিহোভার আদেশ অমান্য করার ফলেই মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু খৃষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মাত্রই জন্মগত ভাবে পাপী। এই পাপ থেকে উদ্ধার লাভের ক্ষমতা মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই অনুপস্থিত।

(৩) **পাপীদের উদ্ধার ঃ** নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুযায়ী যিহোভা অশেষ কৃপাপরবশ হয়ে পাপীদের উদ্ধারের জন্য তাঁর সৃষ্ট সন্তান যিশুকে ধরাধামে অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যিহোভার বিদ্বেষ প্রশমিত করার জন্য যিশু মানবজাতির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ক্রুশকাঠে।

(৪) **পুনরুত্থান ঃ** ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় দিনে যিশু স্বশরীরে কবর থেকে উত্থিত হলেন এবং জেরুজালেমে তাঁর প্রধান শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁদের কাছে নানা চিহ্ন দেখিয়ে প্রমাণ করলেন, তিনি যিশুই ; রক্তের বিনিময়ে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

(৫) **স্বর্গারোহন ঃ** কিছুক্ষণ পরে একই দেহে যিশু স্বর্গারোহণ করলেন এবং উপস্থিত হলেন যিহোভার সামনে ; তাঁকে যাঁরা একমাত্র উদ্ধারকারী হিসাবে মান্য করে তাঁদের মুখপাত্র হয়ে যিহোভার কাছে বক্তব্য রাখার জন্য।

(৬) **পরিত্রাণ ঃ** সেই থেকে যেসব মানুষেরা যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা হিসাবে মানে এবং যিশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ইত্যাদি ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করে, তাদের জন্য যিহোভার উপহার হলো পরিত্রাণ। মানুষ যতই জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান ও সৎ হোক না কেন, যিশুর ধর্মেতে বিশ্বাস বিনা

পরিত্রাণ লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

(৭) **চার্চ বা ধর্মমণ্ডলী:** যারা যিশুখৃষ্টকে একমাত্র পরিত্রাতা হিসাবে গণ্য করে তাদের সংগঠনই হলো চার্চ। চার্চের কাজ—ভজনা, প্রার্থনা, শিক্ষাদান, দীক্ষাদান, অবিশ্বাসীদের খৃষ্টানকরণ ইত্যাদি।

(৮) **আজ্ঞা:** যিশু সমস্ত বিশ্বাসীদের ওপর চার্চের কর্মভার অর্পণ করেছেন। চার্চের অধীন করেছেন গোটা পৃথিবী। সেই সঙ্গে তিনি যাবতীয় অবিশ্বাসীদের জান-মান-সম্পত্তি অর্পণ করেছেন বিশ্বাসীদের কাছে।

(৯) **মিশন বা প্রচার সমিতি:** যেন তেন প্রকারেন যে কোনও স্থানে এবং যে কোনও সময়ে অবিশ্বাসীদের খৃষ্টধর্মের অধীনে আনাই চার্চ বা খৃষ্টমণ্ডলীর কর্তব্য। এইভাবে পৃথিবী যিশুখৃষ্টের পুনরাগমনের জন্য প্রস্তুত হবে—যা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সঠিক সময়টি অপ্রকাশিত। যিশু শেষ পর্যন্ত সমস্ত অবিশ্বাসীদের জয় করবেন এবং হাজার বছরের জন্য পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

(১০) **শেষ বিচার:** যিশুর পুনরুত্থানের হাজার বছর পরে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে তাদের স্বশরীরে উত্থিত করা হবে। তারা শেষ বিচারের জন্য এসে দাঁড়াবে যিহোভার সামনে। সে সময়ে যারা যিশুকে একমাত্র পরিত্রাতা হিসাবে মান্য করেছে তাদের হয়ে ওকালতি করবেন যিশু। ফলে স্বর্গে গিয়ে তারা সুখে বাস করবে। কিন্তু যারা যিশুকে পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করেনি, তারা নিক্ষিপ্ত হবে নরকে এবং অনন্তকাল ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।

সংক্ষেপে এই হলো খৃষ্টীয় ধর্মমত। খৃষ্টীয় চার্চ ও মিশনগুলি এই বক্তব্যগুলিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সংযোজন দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন উপরিউক্ত মতগুলিকে আক্ষরিকভাবে মেনে চলতে। এগুলিকে রূপক ধরে নিয়ে কোনও রকম অপব্যাখ্যা না করতে। কারণ, আক্ষরিক অর্থ না মেনে রূপক বলে চিহ্নিত করলে যিশুর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, পুনরাগমন ইত্যাদি ঘটনা পুরাণের বিষয়বস্তু বলে গণ্য হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারাবে।

পেশীর ব্যবহার: খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পেশীর ব্যবহার বাইবেল সম্মত। বাইবেলে আছে; "যে জয়ী হবে এবং আমার কাজগুলিকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে তাকে আমি কর্তৃত্ব দেব জাতিসমূহের ওপরে। মাটির পাত্রগুলিকে মানুষ যেমন ভাবে ভেঙ্গে ছত্রাকার করে দেয়, সেইভাবে একটুকরো লৌহখণ্ড নিয়ে সে প্রভুত্ব করবে জাতি সমূহের ওপরে—ঠিক যেমন আমি পরম পিতার কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছি প্রভুত্ব, তার হাতে তুলে দেব আমি প্রভাতী নক্ষত্র।"[1]

সেই প্রভাতী নক্ষত্র হাতে পাবার আশায় যুগ যুগ ধরে খৃষ্টান মিশনারীরা পেশীর ব্যবহার করেছে অখৃষ্টান মানুষদের ওপর। যিশুর জীবনকালে গোটা ইউরোপে বাস করতো মূর্ত্তিপূজকরা। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ছিল মূর্ত্তিপূজকদেরই সভ্যতা। পরবর্তীকালে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও রক্তপাতের দ্বারা ইউরোপীয় মূর্ত্তিপূজকদের ধর্মান্তরিত করা হয়। এইসব ধর্মান্তরিত খৃষ্টানরা আবার জলদস্যু, লুটেরা ও দাস ব্যবসায়ীরূপে ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে। তারা অধিকৃত অঞ্চলের মানুষদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে বলপ্রয়োগের দ্বারা। তারপর তাদের দাসদাসীরূপে চালান দেয় দেশ-বিদেশে।

ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য খৃষ্টানরা সর্বদাই রাজশক্তির অনুগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট। বাইবেলে আছেঃ "ফ্যারাওকে উদ্দেশ্য করে শাস্ত্র বলেছেঃ সারা বিশ্বে আমার নাম যাতে প্রচারিত হয় সেইজন্য তোমার মধ্য দিয়ে আমার শক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে উন্নীত করেছি।"[1.৪] আরও আছে; "তাই সর্বপ্রথমেই আমার অনুরোধ সকল মানুষের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, অনুনয়, আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ো, রাজাদের আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্যে—যাতে আমরা সবদিক থেকে শান্তিতে, নিশ্চিন্তে সৎ এবং সম্মান নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।"[1.৭]

কনষ্টানটাইনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন ইউরোপের রোমক সম্রাটরা ছিলেন মূর্ত্তিপূজক। পিতা কনষ্টানষ্টিয়াসের মৃত্যুর পর কনষ্টানটাইন এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ওই যুদ্ধে খৃষ্টানরা তাঁকে প্রভূত সাহায্য করে। ফলে কনষ্টানটাইন খৃষ্টানদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জারী করা বিভিন্ন আদেশ বাতিল করে দেন তিনি। 324 খৃষ্টাব্দে লিসিনিয়াসের সঙ্গে যুদ্ধে কনষ্টানটাইনের ধ্বজা ছিল ক্রশ আঁকা। আর লিসিনিয়াসের ধ্বজাতে ছিল মূর্ত্তিপূজকদের চিহ্ন। ওই যুদ্ধকেই ইউরোপে মূর্ত্তিপূজক ও খৃষ্টানদের অস্তিত্বের লড়াই বলে চিহ্নিত করা হয়। লিসিনিয়াসের পরাজয়ের ফলে মূর্ত্তিপূজকেরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হন রাজানুগ্রহ থেকে। খৃষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীর হাতে চলে যায় রোমক সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ব্যবস্থা। রোমের বিশপই হন খৃষ্টীয় ধর্মমণ্ডলীর সর্বোচ্চ নেতা। এই পদই পরে পোপ নামে অভিহিত হতে থাকে। খৃষ্টীয় অধিকারের পরে নানারকম বাধানিষেধ আরোপের দ্বারা দমন করা হতে থাকে ইউরোপের মূর্ত্তিপূজকদের। যদিও কনষ্টানটাইন খৃষ্টধর্মে রীতিসম্মতভাবে দীক্ষিত হন 334 খৃষ্টাব্দে—মৃত্যুর মাত্র দশমাস আগে।

প্রথম দিককার খৃষ্টমণ্ডলীর নেতারা, বিশেষ করে সেণ্ট অগাষ্টিন (354-430) বলপ্রয়োগকেই ধর্মান্তরকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে সিদ্ধান্ত নেন। কনষ্টানটাইনের পরবর্তীকালের রোমক সম্রাটরা, যারা রোমের বিশপের আশীর্বাদ বলে একই সঙ্গে ঐহিক এবং পারত্রিক জগতের পিতার পদলাভ করেছিলেন, ব্যাপক বলপ্রয়োগের দ্বারা বিশ্বজুড়ে ধ্বংস সাধন করেছিলেন পৌত্তলিকতাবাদের। খৃষ্টমণ্ডলী ইউরোপের অন্যান্য রাজাদেরও আদেশ দেন তাদের প্রজাদের বাধ্যতামূলকভাবে খৃষ্টান করতে। আগুন আর তরবারির দ্বারা জার্মান, কেল্ট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, স্লাভ ও অন্যান্য পৌত্তলিক জাতিরা খৃষ্টায়িত হয়।

1493 খৃষ্টাব্দের 28শে জুন পোপ আলেকজাণ্ডার এক সনদ বলে গোটা পৃথিবীকে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করে দেন। পর্তুগালের ভাগে পড়ে ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্য। স্পেনের ভাগে পড়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমেত গোটা আমেরিকা।

সেই অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেনের রাজা একের পর এক জাহাজ ভর্তি সৈন্য ও মিশনারী পাঠান নব আবিস্কৃত আমেরিকা মহাদেশের দিকে। এইসব মিশনারী সাধুদের বর্বর কীর্ত্তিকলাপ ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করছে।

দুই আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে তখন রেডইণ্ডিয়ান, অ্যাজটেক, ইনকা, মায়া ইত্যাদি বহু আদিবাসীর বাস। বোম্বেটের দল আমেরিকার স্থলভাগে পেঁছে উপস্থিত হলো আদিবাসীদের কাছে। পকেট থেকে বের করলো পার্চমেণ্ট কাগজে লেখা 'রিকোয়ারমেণ্টো।' রিকোয়ারমেণ্টো হলো বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ। নির্দেশ স্বয়ং মহামান্য পোপের; যিনি কিনা গোটা পৃথিবীর জলস্থলের অধীশ্বর!

অধিবাসীরা না জানে স্পেনীয় ভাষা না জানে পোপ, ক্যাথলিক চার্চ বা স্পেনের রাজাকে। তাতে কী! মৌলবাদী বর্বরেরা গড় গড় করে পড়ে যেত, এতদ্বারা তোমাদের সর্বশক্তিমান পোপ ও তাঁর খৃষ্টমণ্ডলীর বশ্যতা স্বীকার করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় তোমাদের জান-মান-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরা স্প্যানিশ ভাষা না বুঝলেও বোম্বেটেদের তরবারির ভাষা বুঝতো। তারা সুড় সুড় করে এগিয়ে যেত মিশনারীদের দিকে। খৃষ্টান উপনিবেশ নির্মাণের জন্য বেগার শ্রমিক হিসাবে খাটানো হতো তাদের। অনাহারে আর অত্যাচারে তাদের অধিকাংশেরই সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো অচিরেই।

তারা 'পুরস্কৃত' হতো 'খৃষ্টীয় কবরের' দ্বারা। 'মোক্ষলাভ' করতো তাদের আত্মা। শরীরটাতো তাদের পাপে ভরা![1.10]

তারপর থেকে মিশনারীরা জোব্বার পকেট থেকে পার্চমেন্ট পেপার বের করলেই আদিবাসীরা ছুট দিত গ্রাম ছেড়ে। তাতে তাদের জান বাঁচলেও মান-সম্পত্তি বাঁচতো না। বাঁচতো না স্ত্রী-সন্তানরা। কী হতো আমেরিকার আদি-বাসীদের স্ত্রী-সন্তানদের? স্ত্রীরা তো পাপে ভরা বিজাতীয়। তাদের নিশ্চয় বোম্বেটে বা মিশনারীরা বিয়ে করতে পারে না। তবে তাদের উপপত্নী করে রাখতে বাধা নেই। সুতরাং তারা স্থান পেত মিশনারীদের হারেমে। আর শিশুগুলো তো কচিকাঁচা। তাদের বাপ মা পাপী হলেও তাদের মনে তো পাপ ঢোকেনি ততোটা—সেই আদিম পাপ ছাড়া! কাজে কাজেই তাদের আলাদা করে অনাথ-আশ্রমে মানুষ করা হতো পৃথিবীর খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। যাতে যিশুর পুনরাগমনের সময় পৃথিবীটা খৃষ্টানে টই-টুম্বুর হয়ে যায়! এইভাবে গোটা আমেরিকা মহাদেশের আদি অধিবাসীদের নিহত ও শৃঙ্খলিত করে খৃষ্টধর্মের শান্তির বাণী প্রচার করে স্পেনীয় বোম্বেটেরা।

পল জনসন খৃষ্টধর্মের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য বিচারের কথা বলেছেন। 1539 খৃষ্টাব্দে ওমেটোচিজিন নামক এক রেড ইণ্ডিয়ানকে ধরে আনা হলো বিচারের জন্য। তার বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র ও দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল। ওমেটোচিজিন বললো স্বধর্মাচরণের অধিকারের কথা। বিভিন্ন গোত্রের বিদেশী সাধু ও জনসাধারণ বিভিন্ন রকম পোষাক পরে। তাদের ধর্মাচরণের নিয়মাবলীও পার্থক্যযুক্ত। স্পেনীয়রাও মদ খায়, নিজের ধর্ম সম্বন্ধে কটুক্তি করে। তাহলে ইণ্ডিয়ানরাই বা নিজেদের ধর্ম নিয়ে বাস করতে পারবে না কেন?

বধির দেওয়াল ওমেটোচিজিনের প্রশ্নে কর্ণপাত করেনি। পৌত্তলিকতার অপরাধে ঘাতকের খড়্গ নেমে এসেছিল ওমেটোচিজিনের মাথায়![1.11]

বর্বর খৃষ্টান মিশনারীরা মূর্ত্তিপূজকদের হত্যা ও বন্দী করেই ক্ষান্ত হয়নি; ধ্বংস করেছিল মূর্ত্তিপূজকদের সভ্যতার যাবতীয় চিহ্নও। মেক্সিকোতে ছিল অ্যাজটেক সভ্যতা আর পেরুতে মায়া সভ্যতা। তাদের ছিল বড় বড় সুন্দর সুন্দর মন্দির। মেক্সিকোর প্রথম বিশপ জুয়ান ডি জুমারাগা 1531 খৃষ্টাব্দে লিখেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাঁচশো মন্দির আর কুড়ি হাজার মূর্ত্তি ভেঙ্গেছেন। এইসব বর্বরতা থেকে মন্দির ছাড়াও অন্যান্য সৌধও রক্ষা পায়নি। বর্বর মিশনারীদের কার্যকলাপের জন্য জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙ্গা সৌধ ছাড়া এইসব সভ্যতার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না।

ষ্টিফেন নেল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সেবায় পোপের পদাধিকার সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

(১) মানুষের হৃদয়ে লিখিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করে তাদের শাস্তি দেবার দৈবী অধিকার পোপের উপর ন্যস্ত। ওইসব অপরাধের মধ্যে আছে পৌত্তলিকতা—যা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত।

(২) 'সুসমাচার' প্রচারকদের দেশের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য পোপ বিভিন্ন অখৃষ্টান শাসকদের আদেশ দিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনও পাল্টা ব্যবস্থা নেই। কারণ, অখৃষ্টানরা ভ্রান্ত, কিন্তু খৃষ্টানরা সত্যপথে বিচরণ করে।

(৩) পোপ যেহেতু পৃথিবীর সর্বত্র খৃষ্টানদের রক্ষাকর্তা, সেহেতু বিভিন্ন দেশে খৃষ্টানদের 'নিরাপত্তার' জন্য পোপ ব্যবস্থা নিতে পারে।

(৪) যদি অখৃষ্টান শাসকেরা খৃষ্টানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তবে পোপ তাদের শাসন ক্ষমতা বাজেয়াপ্ত করতে পারে।[1.12]

স্পেনীয়রা যখন পোপের নির্দেশে জাহাজ ভাসিয়েছিল আমেরিকার দিকে তখন একইভাবে পর্তুগালের রাজা বোম্বেটে পাঠিয়েছিলেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। কিন্তু তাদের তরবারী ও পোপবাণী তেমন সফল হয়নি। কারণ স্থলের যুদ্ধবিদ্যায় এশিয়ার অধিবাসীরা তেমন অদক্ষ ছিলনা। তাছাড়া বুদ্ধ-কণফুশিয়াসের ধর্ম বা হিন্দু-শিন্টো ধর্মের কাছে খৃষ্টধর্মের ছলচাতুরী বিশেষ টেঁকেনা। জল দস্যুতায় পারঙ্গম হওয়ার দরুণ উপকূলের কিছু কিছু অঞ্চলে হয়তো পর্তুগীজরা সাময়িকভাবে সুবিধা করতে পেরেছিল।

এবার আসা যাক ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে। 1498 খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার আগে থাকতেই খেপে খেপে বেশ কিছু খৃষ্টান মধ্যপ্রাচ্য থেকে এদেশে আসে এবং মালাবার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইতিহাস এবং পুরাতত্ব ঘেঁটে যা জানা যায় তাহলো, তাদের বসবাস ছিল পারস্য দেশে। পারস্যের বিরুদ্ধপক্ষ রোমক সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে পারসিক খৃষ্টানরা রাজনৈতিক সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধ্য হয় দেশত্যাগ করতে। তারা ভারতে এসে মালবার অঞ্চলের বন্দরে মশলা ইত্যাদির ব্যবসা করতে থাকে। ভারতীয় রাজত্বে পূর্বসুরী ইহুদি ও পারসিকদের মত তাদের জীবনযাপনও শান্তিপূর্ণ ও নিরুদ্বেগ হয়। স্থানীয় রাজারা তাদের গীর্জা নির্মাণের জন্য জমিও প্রদান করেন। জীবন যাপনের প্রয়োজনে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। অভ্যস্ত হতে থাকে স্থানীয় খাদ্য ও পানীয়েও। স্থানীয় লোকাচারও তাদের উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে। সময়ের

সঙ্গে তাদের এমনই ভারতীয়করণ হয় যে বিভিন্ন পর্যটকেরা পৌত্তলিক ভারতীয়দের থেকে তাদের পৃথক করে চিনতেও পারেননি।

কিন্তু 1498 খৃষ্টাব্দের 7ই নভেম্বর ভাস্কো-ডা-গামা কোচিনে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই 'সিরিয়ান' খৃষ্টানরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। যদিও কদিন আগেই গামা কালিকটে কামান দেগেছেন স্থানীয় জামোরিন রাজার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে। কারণ, রাজা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে রাজী হননি। শুধু কামান দাগাই নয়, গামা কালিকট শহরে চাল সরবরাহকারী জাহাজ লুট করে তার নাবিকদের হাত, নাক, কান কেটেও নিয়েছেন। জামোরিন রাজা তাঁর কাছে এক ব্রাহ্মণকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন, গামা তারও হাত, নাক, কান কেটে তার গলায় তালপাতায় লেখা বার্তাতে জানিয়েছিলেন, দূতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি রান্না করে খাবেন।

সিরিয়ান খৃষ্টানরা গামাকে জানালো, তারা পর্তুগালের রাজার বশ্যতা স্বীকার করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে রক্ষিত পূর্বপুরুষদের যাবতীয় চিহ্ন তারা জমা দিল গামার কাছে। এছাড়া তারা গামাকে জানালো, তাদের সাহায্য নিয়ে গামা হিন্দু রাজ্য জয় করতেও পারেন। এই উদ্দেশ্যে ক্রাঙ্গানোরে একটি দুর্গ নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখলো তারা[1.13]।

ভাস্কো-ডা-গামার জলপথ আবিষ্কারের পরে পর্তুগালের রাজা পোপের সনদ মেনে আটজন ফ্রান্সিসক্যান পাদ্রীকে ভারতে পাঠালেন। সেই অনুযায়ী 1500 খৃষ্টাব্দে কালিকটে অবতরণ করলেন পাদ্রীরা। দলে ছিলেন কাপ্টেন পেড্রো আলভারেস কাব্রাল আর পাদ্রী হেনরী। কাব্রালকে জামোরিন রাজা পাত্তাই দিলেন না। কারণ, দুবছর আগেকার ভাস্কো-ডা-গামার কথা তিনি বিস্মৃত হননি। কিন্তু পাদ্রী হেনরী সফল হলেন। একজন ব্রাহ্মণ সমেত কয়েকজনকে প্রলোভনে বশীভূত করলেন তিনি। ক্যাথলিক চার্চ ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়লো।

দীক্ষাদানের পরে পাদ্রী হেনরী সংগৃহিত ব্রাহ্মণটির নাম হলো মিগুয়েল ডি সান্টামেরিয়া। কাব্রাল তার থেকে জানলেন জামোরিন রাজার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিবাদ আছে। তাঁরা এই বিবাদগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের মাটিতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এইভাবে প্রথম ভারতীয় রোমান ক্যাথলিকটি দেশদ্রোহিতার মধ্য দিয়ে সুরু করলো তার ধর্মজীবন।[1.14]

এতৎ সত্ত্বেও খৃষ্টানীকরণের কাজে পর্তুগীজরা তেমন সফল হলো না। যদিও একের পর এক মিশনারী ভর্তি জাহাজ পর্তুগীজ অধিকৃত বন্দরগুলিতে এসে নোঙ্গর করতে লাগলো। বৃহৎ হিন্দুসমাজ তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতেই

তাকিয়ে রইলো। কেবল সমাজের প্রান্তের কিছু মদ্যপ বেশ্যাসক্ত ও পর্তুগীজ নাবিকদের সেবাদাসীরা পার্থিব লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করলো খৃষ্টধর্ম। আর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলো উপকুলের জেলেরা। কারণ, পর্তুগীজরা হুমকি দিল তাদের জাত-ব্যবসা বন্ধ করে দেবার।

পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি ধর্মান্তরকরণের খরচের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন পাদ্রীদের হাতে। এর কিছু টাকা দিয়ে পাদ্রীরা অনাথ বালক-বালিকাদের কিনে তাদের খৃষ্টান করতেন। এরপর তাঁরা হাত বাড়ালেন কোচিন উপকূলের পানিক্করদের দিকে। পানিক্করদের বংশানুক্রমিক পেশা ছিল যুদ্ধবিদ্যা শেখানো। পাদ্রীরা ভাবলেন পানিক্করদের খৃষ্টান করতে পারলে তাদের ছাত্র নায়াররাও খৃষ্টধর্মের সতরঞ্চির মধ্যে এসে বসবে। প্রতিদিন 'অর্ধফ্যানম' মজুরীর বিনিময়ে কিছু পানিক্কর দীক্ষাস্নান করলো বটে। কিন্তু সে কেবল পর্তুগীজ পাদ্রীদের সামনে। পর্তুগীজ পাড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরেই তারা যথারীতি পৌত্তলিক হয়ে যেত।

পর্তুগালের রাজা ভারতে পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি অ্যালবুকার্ককে নির্দেশ দিলেন, কোচিনের রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে খৃষ্টান করতে। এর আগে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে পর্তুগীজরা রাজাকে সাহায্য করেছিল। রাজা খৃষ্টান হলে স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রজাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন খৃষ্টান হবার জন্য। ফলে একই নৌকায় আরোহণ করবে প্রজারাও।

অ্যালবুকার্ক কোচিনের রাজাকে জানালেন, মহারাজের ওপর প্রভূত স্নেহ ও প্রেম বর্ষণ করেন পর্তুগীজরাজ। এখন পর্তুগীজরাজ মহারাজের পরিত্রাণের জন্য উদগ্রীব।

রাজা চট করে বুঝে ফেললেন অ্যালবুকার্কের কথার তাৎপর্য। উত্তরে বললেন, আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছে যে মালাবারের লোকেরা তাদের নিজস্ব ধর্মকর্ম নিয়েই নিরুপদ্রবে বাস করবে।

অ্যালবুকার্ক উত্তর দিলেন, তাহলে তো মালাবারের লোকেরা কোনও দিন যিশুর নাম বা পবিত্র ক্রুশচিহ্নের কথা জানবে না। যদিও হিন্দুস্থান থেকে বহু দূরে জেরুজালেমে খৃষ্ট তাদেরই মুক্তির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন, ব্যাপারটা তাই বটে!

উৎসাহিত হয়ে অ্যালবুকার্ক বলতে লাগলেন, মালাবারের লোকেদের আচার ব্যবহার শুধু ভ্রান্তিপূর্ণই নয়, ভয়াবহ! তাদের আত্মার পরিত্রাণলাভের সম্ভাবনাই নেই।

রাজা চিন্তা করে বললেন, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ! এ ব্যাপারে চট করে

সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। অবসর সময়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। আচ্ছা, আপনি কি কালিকট আর ক্রাঙ্গানোরের রাজাকেও এ প্রস্তাব দিয়েছেন?

অ্যালবুকার্ক জবাব দিলেন, খৃষ্টান হবার প্রথম সুযোগটা পর্তুগালরাজ আপনাকেই দিতে চান। আলাপচারীর শেষে অ্যালবুকার্ক জানালেন, মহারাজ যদি রাজী না হন তাহলে পর্তুগালরাজ এমন একজনকে সিংহাসনে বসাবেন, যিনি পর্তুগালরাজের কথা অমান্য করবেন না।

অ্যালবুকার্ক তাঁর হুমকি চালিয়ে যেতে পারেননি। কারণ, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু যিশুর ধর্ম কীভাবে সুযোগ পেলেই বিষদাঁত বের করে এ ঘটনা তারই প্রমাণ[1.15]

কৃপার কাঠিন্য[1.16] ঃ

চতুর্দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে ভারতস্থ পর্তুগীজ মিশনারীরা পোপ ও পর্তুগালের রাজাকে জানালেন, ভারতের মাটিতে খৃষ্টধর্ম প্রসারের একমাত্র উপায় 'কৃপার কাঠিন্য।' এটা পর্তুগীজ অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। কৃপার কাঠিন্য হলো খৃষ্টধর্ম প্রসারের জন্য বলপ্রয়োগের মাখন মাখানো নাম। যাতে গিলতে সুবিধা হয়।

বলা-বাহুল্য পোপ রাজী হলেন। পর্তুগালের রাজাও সেই অনুযায়ী আদেশ জারী করলেন। পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে যাবতীয় মন্দির ভেঙ্গে ধূলিস্যাৎ করে তার ইঁট পাথর দিয়ে গীর্জা নির্মিত হতে লাগলো। হিন্দুর দেবদেবীর নির্মাণ ও বাড়ীতে তাদের পূজা ঘোষিত হলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে। হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো পর্তুগীজ রাজত্বের মধ্যে। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হলো প্রতি রবিবার গীর্জার প্রার্থনায় যোগ দিতে। যাবতীয় চাকরী বরাদ্দ হলো শুধুমাত্র ধর্মান্তরিতদের জন্য। হিন্দুদের ব্যবসা করাও নিষিদ্ধ হলো। সমস্ত রকম জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুরূহ হয়ে দাঁড়ালো হিন্দুদের জীবনযাপন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতিটি শিশুকে অনাথ ঘোষণা করে তাদের অর্পণ করা হতে লাগলো মিশনারীদের হাতে। এইভাবে যতো রকমে সম্ভব ততো রকম উপায়ে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চলতে লাগলো।

ইনকুইজিসন[1.17] ঃ

এইভাবে পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল দ্রুত হিন্দুশূণ্য হতে লাগলো। কিন্তু নিজেদের জান-মান-সম্পত্তি রক্ষার জন্য কিছু কিছু হিন্দু বাধ্য হয়েই ধর্মান্তরিত হলো। কিন্তু গোপনে তারা চর্চা করে যেতে লাগলো পূর্ব পুরুষদের ধর্ম— মিশনারীদের কাছে বেশী দিন অজ্ঞাত থাকলো না এ সংবাদ। পরিবর্তে তারা যে দাওয়াই বাৎলালো তার নাম ইনকুইজিসন। ব্যাপারটা কিছুই নয়, খুঁজে খুঁজে এই ধরনের দ্বৈত আচরণকারীকে বের করে নির্যাতন ও হত্যা করা। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল অন্য গোত্রের পাদ্রীরা। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা,

হাত পা কেটে দেওয়া, সারাজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করা কিছুই বাদ গেল না।

সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার: সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা

ভারতভূমি নামক মঞ্চে ক্যাথলিক চার্চের মিশনারীরা যে শয়তানের নাচ প্রদর্শন করে চলেছিল তার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা অবশ্যই সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। যাঁর নামে উৎসর্গীকৃত কলকাতার বিখ্যাত মিশনারী কলেজটি।

প্রাচ্য দেশের সবচেয়ে বড় মিশনারী বলে ক্যাথলিক চার্চের সাধুরা সেণ্ট জেভিয়ারের গুণকীর্তন করেন। ইগনেশিয়াস লয়োলার পরে 1534 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি অফ জেসাসের' দ্বিতীয় বিখ্যাত মিশনারী বলে তিনি কথিত হন। ফ্রান্সিস জেভিয়ারের জন্ম স্পেনের এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে। তিনি পোপের খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন। ফলে পোপ তাঁকে লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগরসহ উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বের সব অঞ্চল ও ভারত বর্ষের প্রধান সুসমাচার প্রচারক (Apostolic Nuncio) হিসাবে নিয়োগ করেন। পর্তুগালের রাজা তাঁকে নিযুক্ত করেন মিশন সমূহের প্রধান পরিদর্শকের পদে। এ ব্যাপারে সরাসরি রাজার সঙ্গে পত্রালাপের দুর্লভ অধিকার তাঁকে দিয়েছিলেন পর্তুগালরাজ।

ফ্রান্সিস জেভিয়ার ভারতে উপস্থিত হলে গোয়ার পর্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি তাঁকে রাজপুত্রের মতই অভ্যর্থনা জানালেন। পর্তুগীজ পাদ্রীরা তাঁকে যাবতীয় জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিপতি রূপে গণ্য করে বশংবদ ভৃত্যের মত মান্য করতে প্রস্তুত হলেন তাঁর নির্দেশ। ফ্রান্সিস জেভিয়ার সমস্ত বিবেচনা করে মত প্রকাশ করলেন যে হিন্দুধর্মের বিনাশের জন্য পর্তুগীজরা এতদিন পর্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে, সেটাই যথাযথ। তিনি অধিকতর কঠিন নীতি প্রণয়ণ করলেন যা একই উদ্দেশ্যে গৃহীত হলো। 'ইনকুইজিসন' প্রয়াগ করা ও চার্চের সহায়তার জন্য রাজশক্তির প্রয়োগ তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। এই 'সন্তের' দক্ষিণ ভারতে স্বল্পকালীন অবস্থানের কালে হিন্দুদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন এক হিংস্র রূপ ধারণ করে।

এইসব মিশনারীরা প্রথম থেকেই বুঝতে পারেন ব্রাহ্মণরাই হিন্দু সমাজের দুর্গরক্ষক। ফ্রান্সিস জেভিয়ার ব্রাহ্মণ বিরোধিতাকে তাঁর মিশনারী তৎপরতার মুখ্য বিষয় বলে স্থির করেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে লিখেছেন "...তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বিকৃত চরিত্রের লোক...কদাচ সত্য কথা বলে না। সরল ও অজ্ঞ লোকেদের মিথ্যা কথা বলে কি করে প্রতারণা করবে সেই চিন্তাতেই সদা ব্যস্ত থাকে...সাদাসিধে লোকগুলো ব্রাহ্মণরা যা বলে তাই করে...ব্রাহ্মণরা যদি না থাকতো তবে সমস্ত হিন্দুরাই আমাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হতো।"[1.18]

এরপর থেকে ব্রাহ্মণদের হত্যা করা এবং ভীতি-প্রদর্শন করা পর্তুগীজদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এটা যে দারুণ কেলেঙ্কারীতে পৌঁছয় তা 1671 খৃষ্টাব্দে কেলাডীর নায়কদের সঙ্গে পর্তুগীজদের চুক্তিতে প্রকাশ। ওই চুক্তিতে আছে, পর্তুগীজরা জোর করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। অনাথ ছেলে-মেয়েদের কেড়ে নিতে পারবে না, পারবে না ব্রাহ্মণদের হত্যা করতেও।

পর্তুগীজদের মারফৎ সমৃদ্ধ ভারতের কথা দেশে দেশে প্রচারিত হওয়ার ফলে লুঠের মালের বখরা নেওয়ার জন্য সবাই এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু পোপের সনদ অনুযায়ী পূর্ব এশিয়ার সমস্তই ছিল পর্তুগীজদের স্বত্বাধীন। লিসবন কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মিশনারী রূপেই অন্য জাতিদের ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিত। ষোড়শ শতাব্দীতে চার গোত্রের মিশনারীরা ভারতে তাদের কার্যকলাপ চালাতো। এরা হলো, ফ্রান্সিসক্যান, ডোমিনিক্যান, জেসুইট এবং আগষ্টানিয়ান। এরা প্রধানতঃ পর্তুগীজ অধিকৃত মালাবার এবং করোমণ্ডল উপকুলেই তাদের কার্যকলাপ চালাতো। কিন্তু দিনে দিনে মিশনারীদের সংখ্যা ফুলে ফেঁপে ওঠার ফলে নতুন নতুন শিকারভূমির প্রয়োজন হয়ে উঠলো। ফ্রান্সিসক্যান ও ডোমিনিক্যানরা মাদ্রাজ ছেড়ে নড়লো না। আগষ্টানিয়ানরা বাংলাকেই পছন্দ করে ফেললো তাঁদের শিকারভূমিরূপে। জেস্যুইটরা একটু বেশী সাহসী, তাঁরা এগিয়ে গেল মোগল সম্রাটের দিকে। যদি কনষ্টানস্টাইনের মত মোগল সম্রাটদের ধর্মান্তরিত করা যায় তবে গোটা ভারতই খৃষ্টসাম্রাজ্যের মধ্যে চলে আসবে। তারা 1580 খৃষ্টাব্দে আগ্রায় সম্রাট আকবরের কাছে মিশন পাঠালো। প্রথমে আকবর পরে জাহাঙ্গীরকে ধর্মান্তরিত করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু হলো না। প্রতিটি প্রতিবেদনেই আগ্রার মিশন জানায়, হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে, এই হলো বলে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। উল্টে মহান মোগল সম্রাট আকবর নিজেই একটি ধর্মমতের সৃষ্টি করেন—যদিও তিনি জেস্যুইট বাবাদের সে ধর্মমতে দীক্ষিত হতে প্ররোচিত করেননি। আর জাহাঙ্গীর গোঁড়া না হলেও সুন্নী মুসলমান ছিলেন আপাদমস্তক। আসলে মিশনারীদের ভারতের ইতিহাস পড়া ছিল না। তারা জানতো না যে 1206 খৃষ্টাব্দ থেকে গোঁড়া ও অত্যাচারী মুসলমানদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও ভারত ইসলামের দেশ হয়ে যায়নি। সে জায়গায় খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য!

প্রথম দিককার মিশনারীরা শুধু যে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল তাই না, হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও ধারণা ছিল না তাদের। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অত্যধিক বিশ্বাস থাকার ফলে তাদের ধারণা ছিল ভারতের নির্বোধ 'জেন্টুরা' যিশুর

জন্মবৃত্তান্ত, পুনরুত্থান আর পুনরাগমনের কথা শুনেই পটপট করে খৃষ্টান বনে যাবে। তাদের কাছে খৃষ্টধর্মের সত্যতা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। এই সামান্য বোধটুকু তাদের ছিল না যে ওই সব সত্য সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। নিজেদের ভাব-পৃথিবীতে কুপমণ্ডুক হয়ে বাস করতো তারা।

সুতরাং ভারতের বিভিন্ন বাজার হাটে গিয়ে দাঁড়াতো মিশনারীরা। গড়গড় করে কীর্তন করে যেত স্বধর্মের মহিমা এবং পৌত্তলিকতার 'পাপের' কথা। মিশনারীদের অদ্ভুত পোষাক, ভাষা আর ভাবভঙ্গী স্থানীয় লোকেদের কাছে বেশ মজার ব্যাপার ছিল। হাতে কাজ না থাকলে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সার তামাশা দেখতো। বক্তৃতা শেষে কোন প্রশ্ন না করে ফিরে যেত নিজের কাজে। মিশনারীরা ভাবতো হিন্দুদের মাথায় পুরো থান ইট পোরা!

হিন্দুদের এই মজাদার উপেক্ষায় ক্রুদ্ধ হতো মিশনারীরা। তারা হিন্দুদের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিকে ক্রমাগত কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চালাতো। ভয় দেখাতো, 'পাপীরা' নরকে পতিত হয়ে পুড়ে মারবে। 'পাপ', 'পরিত্রাণ' আর 'নরক' ছিল মিশনারীদের ব্যবসার মূলধন। কিন্তু মিশনারীরা ক্রোধে যতই মুখের ফেনা বের করুক না, হিন্দুদের কাছ থেকে উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই জুটতো না। ফলে ক্রমাগত ক্রুদ্ধ হতো ধর্মান্ধরা। 1582 খৃষ্টাব্দে জেসুইট মিশনের ভ্যালিগনাগো লিখেছেন, বলপ্রয়োগ ছাড়া দেশীয়দের কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যাচ্ছে না।[1.19]

ভারতভূমিকে খৃষ্টানীকরণের জন্য মিশনারীরা শেষ পর্যন্ত দুটি পথ অবলম্বন করলেনঃ এক, রাজরাজড়াদের খৃষ্টান করে তাদের প্রজাদের ব্যাপক হারে খৃষ্টান করার পথ। প্রথম দিককার মালাবারের রাজাদের খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উৎসাহ তাদের এ পথে যেতে প্ররোচিত করেছিল। যদিও রাজারা ওই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মূলতঃ পর্তুগীজ জলদস্যুদের চাপে। তাছাড়া হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় সমাজের মত ভূস্বামী ও ভূমিদাসদের মধ্যে বিভক্ত ছিল না। হিন্দুদের বিভাগ স্তরে স্তরে—প্রতিটি স্তর অন্য স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায়। রাজারা তাই বার বার বলেছেন, প্রজাদের ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতায় তাঁরা কদাচ হস্তক্ষেপ করবেন না।

অন্য পথ হলোঃ দরিদ্র ভারতবাসীকে নানারকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে দলে টানা। টাকা পয়সা ও চাকরীর বিনিময়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সবাইকে কিন্তু মানসিকভাবে খৃষ্টান করা যেত নাঃ আজও যায় না। এই দ্বিতীয় পথেই আজ পর্যন্ত হেঁটে চলেছে মিশনারীরা।

রবার্ট ডি নোবিলির তঞ্চকতা

খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ছল বল কৌশলের প্রয়োগ বাইবেল সম্মত।[1.20] মাদুরাই মিশনের জেসুইট পাদ্রী ডি নোবিলি খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তঞ্চকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেন্ট জেভিয়ার্সের মত নোবিলিও বুঝেছিলেন হিন্দু দুর্গের রক্ষক হচ্ছে ব্রাহ্মণরা। রাজা বা প্রজা কেউই নয়। সেন্ট জেভিয়ার ব্রাহ্মণদের ধ্বংস করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ডি নোবিলি চাইলেন ব্রাহ্মণদের কাজে লাগাতে। তিনি ঠিক করলেন, ব্রাহ্মণদের প্রথম ধর্মান্তরিত করবেন। ডি নোবিলি মাদুরাই মিশনের কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। সংস্কৃত ও তামিল শিখলেন, কয়েকটি গ্রন্থও পড়লেন হিন্দুধর্মের। নিরামিষাশী হয়ে দিনে কয়েকবার স্নানও করতে লাগলেন। তারপর গেরুয়া পোষাক পরে একটা আশ্রম বানালেন শহরের প্রান্তে। কিন্তু এতো করেও আশ্রমে তেমন ভক্তসমাগম হলো না। কেননা গেরুয়া বেশধারী 'সন্ন্যাসী' যে আসলে একজন ফিরিঙ্গি সেটা সবাই ধরে ফেললো। নোবিলি বললেন, তিনি পর্তুগীজদের মত ফিরিঙ্গি নন, রোম শহরের একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান। তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বেশ কিছু লিখে একটা বই তৈরী করে সেটা 'যজুর্বেদ' বলে চালাতে লাগলেন। ফলে কিছু অবোধ ব্রাহ্মণশিশু ধরা পড়লো তাঁর জালে। তাদের কুয়ার জলে স্নান করিয়ে নোবিলি ভাবলেন পৃথিবীতে খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়ালেন। নোবিলি মোট 120 জন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে বারোজন ছিল ব্রাহ্মণ—দুজন মহিলা, দুটি শিশু আর আটজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক !

কিন্তু অন্য গোত্রের খৃষ্টানদের বিরোধিতার ফলে নোবিলির আশ্রম ভেঙ্গে দিতে হলো। তাদের অভিযোগ নোবিলি গেরুয়া বসন পরে ও যজুর্বেদ লিখে উন্নত খৃষ্টান সংস্কৃতির অবমাননা করছেন। নোবিলি অবশ্য বললেন, তিনি যজুর্বেদ নয়, যিশুর্বেদ লিখেছেন ![1.21]

২. ডিরোজিওর উদ্ভাসের পটভূমি

ক্যাথলিক মিশনারীরা ভারতে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেও ইংরেজরা প্রাথমিকভাবে বাণিজ্য করতেই এদেশে এসেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হলেও নিরাপদে সাম্রাজ্য ভোগ ও বাণিজ্য করার মানসে এদেশের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। তারা বিরোধী ছিল যে কোনও রকম মিশনারী কার্যকলাপেরও। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক পরিচালক নাকি বলেছিলেন, একদল মিশনারীর থেকে একদল শয়তানকে বরং বরদাস্ত করবো।

1806-7 খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ামের সহকারী অধ্যক্ষ পাদ্রী বুকানন কলকাতায় কয়েকটি বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন। এর ফলে দেশীয়দের মনে আঘাত লাগায় সরকার বুকাননের বক্তৃতা বন্ধ করে দেন। 1807 খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত ইসলামের তুলনায় খৃষ্টধর্মের অধিক মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী একটি ফার্সী পুস্তক সরকারী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করায় বইটির অবশিষ্ট 1700 কপি বাজেয়াপ্ত করা হয় মিশনারীদের কাছ থেকে নিয়ে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ট্রাক্টে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কুৎসা ঘোষণা করায় উদ্বিগ্ন হয়ে সরকারের তরফ থেকে মিশনারী উইলিয়াম কেরীকে বিরত হতে বলা হয় এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশ থেকে।[2.1]

এদিকে বৃটিশ শাসনের ফলে হিন্দুদের মনোজগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটলো। প্রায় ছশো বছরের ইসলামী শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হলো হিন্দুরা। সেমীয় ইসলাম খৃষ্টধর্মের মতই সম্প্রসারণবাদী। পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। বাইবেল পৌত্তলিকদের ঘৃণা করেই ক্ষান্ত, কিন্তু কোরাণের নির্দেশ পৌত্তলিকদের হত্যা করা।[2.2] মহম্মদ বিণ কাশিম সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণ করে যুবতীয় পুরুষ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। পরে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অগণিত হিন্দুদের হত্যা করা বাস্তবসম্মত বোধ না হওয়াতে হানাফী ফিক্ অনুযায়ী খৃষ্টান ও ইহুদীদের মত হিন্দুদেরও অধম নাগরিক 'জিম্মী' বানানো হতে থাকে।

জিম্মীদের জিজিয়া কর দেওয়া কর্তব্য। সরাসরি হত্যা না করে করের চাপ দিয়ে 'ভাতে টান' দিয়ে মুসলমান বানানোই জিজিয়ার উদ্দেশ্য। মূল জন্মভূমি থেকে খৃষ্টানী মুছে যাওয়ার কারণ এই জিজিয়া বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আক্রমণকারীরা যত সম্ভব হিন্দু বৌদ্ধ-জৈন মঠ মন্দির ও বিহার ধ্বংস করে ইসলাম-সম্মত ভাবে। সেইসব ইমারতী দ্রব্য দিয়েই তৈরী করে নানা মসজিদ। হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যায় পেরে না উঠে অবলম্বন করে শম্বুক বৃত্তির। নিজেদের গুটিয়ে নেয় তারা। মুসলমান আক্রমণকারীদের থেকে ক্রমাগত পালিয়ে পালিয়ে বাঁচে। হিন্দুদের মধ্যে জাতিবিভাগ প্রথা দৃঢ়মূল হওয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক কোশাম্বী বলেছেন, "মুসলিম সামন্ততান্ত্রিক চাপের কাছে গ্রামের রক্ষা পাওয়ার শেষ উপায় ছিল সদলবলে গ্রাম ত্যাগ করা…জাতিবিভাগ ছিল রক্ষা পাওয়ার অতিরিক্ত উপায়। অন্য গ্রামের স্বজাতিদের রক্ষা করার জন্য আশ্রয়দান গ্রামবাসীদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল।"[2.3]

পলায়ন ছাড়া উপায়ও ছিল না। মুসলিম আক্রমণের আগে ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু সাংস্কৃতিক একতা ছিল। বৌদ্ধ-জৈন-সনাতন সংস্কৃতি একত্র বিরাজ করতো। যুদ্ধবিগ্রহ ছিল; কিন্তু যুদ্ধের পরিণতি ছিল বশ্যতা স্বীকার। কিন্তু মুসলমানরা প্রধানতঃ লুটেরা। তার কারণ যুদ্ধজয়ের ফলে লুট করা সম্পত্তির শতকরা আশিভাগ লুটেরা সৈন্যদের প্রাপ্য। এই লুটের মালের মধ্যে বিধর্মীর স্ত্রী কন্যাও আছে। বিধর্মীর স্ত্রী কন্যাকে বিবাহ না করেও উপভোগ করা ইসলাম সম্মত।[2.4] আবার পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতলে 'গাজী' হওয়ার পুরস্কার, শহীদ হলেও উন্নত স্বর্গবাস। এ জাতীয় ধর্মীয় বোধই মুসলমানদের তরবারীকে অধিকতর শানিত করে তোলে।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বিজয়নগরের যুবরাণী গঙ্গাদেবী 'মধুরাবিজয়ম' নামে এক মহাকাব্যে লেখেন, "ওই দুষ্ট ম্লেচ্ছের দল হিন্দুধর্মের ওপর নিত্য নিত্য প্রহার করতো। ওরা দেবপ্রতিমা ভেঙ্গে ফেলতো এবং পূজাপাত্রগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলতো। ওরা শ্রীমদ ভাগবৎ এবং অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ আগুনে ফেলে দিত। ব্রাহ্মণের দেহে যে চন্দনলেপ করা হত তা চেটে নিত। কুকুরের মত তুলসী গাছে প্রস্রাব করতো এবং মন্দিরের ভিতর জেনেশুনে মলত্যাগ না করে ছাড়তো না। পূজারত হিন্দুদের ওপর ওরা কুলকুচো করতো এবং হিন্দু সাধুসন্তানদের সবসময়েই সন্ত্রস্ত রাখতো। বোধ হতো যে ওরা বুঝি কোনও পাগলা গারদ থেকে বেরিয়ে এসেছে।"[2.5]

এমত পলায়ণপর জাতির পক্ষে কোনও ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার সাধন করা সম্ভব ছিল না। বৈদিক হিন্দুরা যে অন্যান্য আদিজাতিদের সাংস্কৃত্যায়ন (aculturisation) সুরু করেছিলেন, বর্বরতার আশ্রয় না নিয়ে আদিজাতিদের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময় করে যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিস্তার বন্ধ হয়ে যায় ইসলামী আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে। সুলতানি আমলে বঙ্গদেশে যে এক মাত্র উল্লেখযোগ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক জন্মেছিলেন, তিনি শ্রীনিমাই মিশ্র। কিন্তু সেই নিমাই মিশ্রও তাঁর কর্মক্ষেত্র হুসেন শাহী বাংলা থেকে সরিয়ে উড়িষ্যায় হিন্দু প্রতাপরুদ্রের রাজত্বে নিয়ে যান।

এমত অবস্থাতে যা হয়। হিন্দুরা তাদের সনাতন ধর্মের মূলকথা ভুলে গিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের নিগড়ে নিজেদের বেঁধে ফেলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে বেদ বেদান্তের চর্চা হতো না। চর্চা হতো শুধু স্মৃতি ও ন্যায়ের।[২·৬] কিন্তু স্মৃতি তো আচার-আচরণের শাস্ত্র। আচার-আচরণ শাশ্বত নয়, তা নিত্য পরিবর্তনযোগ্য, যুগের সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। শাশ্বত ধর্মের মূলকথা। কিন্তু অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজে আচার-আচরণই ছিল হিন্দুধর্মের অপর নাম। তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজে ঢুকেছিল ব্যাভিচার। ব্রাহ্মণ সমাজের স্তরবিন্যাস নিত্য সংস্কারের অভাবে কুলিনী বহুবিবাহে পর্যবসিত হয়েছিল। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাভিচার, শিশুহত্যা আর পতিতাবৃত্তি। সহমরণ প্রথা আদিতে ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের আচরণীয় প্রথা।[২·৭] সেটি স্মৃতিশাস্ত্রের লিপিকারদের প্রমাদে প্রবেশ লাভ করেছিল বঙ্গসমাজে।[২·৮]

এদিকে পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে থাকতে গজিয়ে উঠেছে বণিক শহর কলকাতা। ব্যবসা কুশলী ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে অর্থের আদান-প্রদান করে কলকাতায় এক নতুন বঙ্গসমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এই বঙ্গসমাজের মাতব্বররা ধনী; কিন্তু ব্যাভিচারী, ভণ্ড, অসংবৃত এবং অনাচার-সর্বস্ব। সে সময়ে বঙ্গসমাজের জীবনযাপনের অঙ্গ ছিল চড়কের সময় আগুন ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ ইত্যাদি বীভৎসতা ও কদর্য সং সাজা। দুর্গাপূজার সময়ে বাঈজী এনে মদ মাংস খেয়ে ফূর্তি করা, রাসযাত্রার সময় যৌন আমোদ প্রমোদ, মাহেশে স্নানযাত্রার, সময় মেয়ে মানুষ নিয়ে গিয়ে হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী বাঁধা রেখে জুয়া খেলা শাক্তদের বীভৎস বামাচার, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড়। এসবই ছিল বহুল প্রচলিত।

অবশ্য সমকালে কলকাতায় ইউরোপীয়দের নৈতিক চরিত্রও যথেষ্ট কলুষযুক্ত ছিল। এদেশী মেয়েদের প্রতি আসক্তি, ঘোড় দৌড়, মদ্যপান, জুয়া খেলা

তদানীন্তন ইংরেজ সমাজে ছিল সুপরিচিত ব্যাপার। এ শুধু নীচতলার ইউরোপীয়দের ব্যাপার নয়, উপরের মহলের নৈতিক চরিত্র এমনই ছিল যে কোনও ভদ্রমহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সে গভর্নর জেনারেলের রক্ষিতা হবে কিনা এই নিয়ে আলোচনা চলতো। কোনও তরুনী বঙ্গদেশে এলে তাকে নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। 1780 খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রকাশ্যভাবে ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে ডুয়েল লড়েন। ফ্রান্সিসের সঙ্গে ম্যাডাম গ্রাণ্ডের কেচ্ছা অতি পরিচিত ঘটনা।[২৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের ধর্মবিষয়ে উদাসীনতা বজায় রেখে চলেছে তখন এক 'সুসমাচার প্রচার' আন্দোলন বৃটীশ পার্লামেণ্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করলো ভারতে মিশনারী ও শিক্ষক পাঠাবার জন্য।

1792 খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের সদস্য এবং পার্লামেণ্টের সদস্য চার্লস গ্রাণ্ট একটি বই লিখলেনঃ "গ্রেট বৃটেনের এশিয়াবাসী প্রজাদের সামাজিক অবস্থা—বিশেষ করে তাদের নৈতিক অবস্থা এবং তার উন্নতি ঘটানোর উপায়।" বইটি তিনি কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স এবং পার্লামেণ্টে পেশ করলেন। বইটিতে ভারতীয়দের পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। কারণ পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবেই ভারতীয়দের খৃষ্টান করা সম্ভব হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি পার্লামেণ্ট কি কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স, কেউই ভারতীয় সমাজ ও ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হলেন না।

তবে প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষার খাতে ইতমধ্যেই কোম্পানী কিছু ব্যয় করেছেন। 1781 খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। বারাণসীর বৃটিশ রেসিডেণ্ট 1791 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছেন বারাণসী সংস্কৃত কলেজ। দুটি কলেজই ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান হলেও শাসকদের ব্যবহারিক প্রয়োজন ছিল এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার। কারণ আদালত-কাছারীতে মুসলিম ও হিন্দু আইন ব্যাখ্যার জন্য ওই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় মুসলিম ও হিন্দু যুবক সরবরাহ করবে। সুতরাং ভারতীয় জনগণের মধ্যে নিজেদের ধ্যান ধারণা প্রবিষ্ট করার জন্য এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়নি।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপত্তি করলে কী হবে, মিশনারীরা যে আদৌ নিষ্ক্রিয় ছিল না, তার সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। 1821 খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'র ভূমিকাতে রামমোহন লিখেছেন "...ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল

কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিসনরী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুৎ করিয়া খৃষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার বই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতা ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন। তৃতীয় প্রকার এই যে কোনও নীচ লোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনও কারণে খৃষ্টান হয় তাহাদিগে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।”

বস্তুতঃ কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড, বুকানন, ফরসাইথ প্রভৃতি পাদ্রীরা যে শুধু হিন্দু দেবদেবীর কুৎসা গাইলেন তাই নয়, হিন্দুদের চরিত্রেরও কুৎসা গাইতে লাগলেন মুখের ফেনা বের করে। এমনও বললেন, সতীত্ব নামক জিনিসটা নাকি হিন্দু নারীদের একেবারেই নেই।[2.10]

কিন্তু কোম্পানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম বিতরণের অধিকারের জন্য আন্দোলন চালাতে থাকে। তারা জনগণকে বোঝাতে চাইছিল ভারতবাসীদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের নৈতিক দায়িত্ব তাদেরই।

ইতিমধ্যে 1800 খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলো। যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবীন ইংরেজ অফিসারদের ভারতীয় ভাষা ও আইন শেখানোর জন্যেই এই কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তথাপি এই কলেজ সরকারী অর্থে সংস্কৃত, বাংলা ও ফার্সী চর্চার একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। 1806 খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হলো ভেলোর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের জন্য প্রাথমিকভাবে খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ দায়ী হলেও ব্যাপারটা শাসক-শাসিতের যোগাযোগ হীনতাও সূচিত করলো। মিশনারীরা জানালেন, ইংরেজী শিক্ষা ও খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটলেই শাসক-শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠবে। 1813 খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনের জোসুয়া মার্শম্যান এক পুস্তিকায় লিখলেন, ভারতে বৃটীশ শাসন কায়েম করার জন্য খৃষ্টধর্মের প্রসার অত্যাবশ্যক। চুপি চুপি, শান্তভাবে, অনবরত খৃষ্টীয় আলো প্রবিষ্ট করতে হবে দেশীয়দের মধ্যে। তিনি আরও বললেন, খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার খাতিরেই বৃটীশের বন্ধু। এইসব মানুষের অস্তিত্ব বৃটীশ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বের ওপরই নির্ভরশীল। যদিও কয়েক কোটি ভারতীয়দের মধ্যে পাঁচ লক্ষ লোক খৃষ্টধর্মাবলম্বী, তবুও সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা এই পাঁচ লক্ষ খৃষ্টানদের বন্ধুত্বও যথেষ্ট

মূল্যবান।[2.11]

1813 খৃষ্টাব্দে বৃটীশ পার্লামেণ্টে ভারতে মিশনারী রপ্তানির সপক্ষে বিখ্যাত বাগ্মী উইলবারফোর্স বললেন, "আমাদের খৃষ্টধর্ম স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ এবং উপকারী, ভারতীয় ধর্মসমূহ ইতর, লাম্পট্যময় এবং নিষ্ঠুর…অত্যন্ত ঘৃণাজনক…।[2.12]

এই ধরনের বক্তব্য বৃটীশ সরকার অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কারণ, উইলবার ফোর্সের প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে পাস হয়ে গেল পার্লামেণ্টে। ফলে 1813 খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত নতুন সনদে একদিকে যেমন দেশীয়দের ঐহিক জ্ঞান বৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য কিছু ব্যয়ের ব্যবস্থা রইলো অন্যদিকে তেমন দেশীয়দের পারত্রিক ব্যাপারে সহযোগীতার জন্য বছরে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড বেতনে গোটা ভারত সাম্রাজ্যের জন্য একজন বিশপের ব্যবস্থা হলো। এছাড়া বিশপের সাহায্যকারী হিসাবে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বার্ষিক দু হাজার পাউণ্ড বেতনে তিনজন আর্চডিকনের ব্যবস্থাও রইলো। এই বার্ষিক এগারো হাজার টাকা অবশ্য ভারতবাসীদের দেয় রাজস্ব থেকে সংগৃহীত হবে। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো ভারতবাসীর বেতনভুক আর্চডিকন ডিয়ালট্রী কীভাবে ডিরোজিও শিষ্যদের শিকারের জন্য মৌলবাদী ডাফের সঙ্গে জাল পেতেছিল।

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের উদ্যোগ প্রথম সফল হয় 1800 খৃষ্টাব্দের শেষে। তাঁরা কৃষ্ণদাস পাল নামক এক সূত্রধরকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হন। এ ব্যাপার নিয়ে ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের বিরাট সংঘর্ষের উপক্রম হয়। পরের বছর 12ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণদাস পালের শালী জয়মনিও খৃষ্টান হন। কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যানের চেষ্টায় 1817 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 700 জন দেশীয় খৃষ্টান হয়েছিল। তবে ধর্মান্তরকরণ ছাড়া শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষাবিস্তার, বাংলা গদ্যের চর্চা, বাংলা সাময়িক পত্রের সৃষ্টি, কাগজ উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা, সহমরণ প্রথার বিরোধিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের কার্যকলাপ অসামান্য। যদিও তাঁরা এ সমস্তই করেছিলেন খৃষ্টানী বিস্তারের উদ্দেশ্যে।

1800 খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে এলেন স্কটল্যাণ্ডের ডেভিড হেয়ার। ব্যবসাসূত্রে বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সংস্পর্শে এলেন তিনি। ফলে নানা কু-সংস্কার ও কু-অভ্যাসের মধ্যে জীবনযাপনরত হিন্দুদের দেখে ব্যথিত হলেন। দেখলেন, হিন্দুরা বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং উদ্যমী। কিন্তু বহু বৎসর ব্যাপী কুশাসনের মধ্যে বাস করার ফলে বিকৃত এবং কু-সংস্কার গ্রস্ত। তিনি অনুভব করলেন, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞানের

আলো বিতরণ না করলে হিন্দুসমাজের এই দুরবস্থা দূর হবে না। ফলে তিনি ব্যবসার অবসরে হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

দেশীয় মানুষদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দেশীয়দের সংগঠিত করে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈষ্টের সহায়তায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। 1820 খৃষ্টাব্দে তিনি ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দোকান-পাট বিক্রী করে যা টাকা পান তাই দিয়ে কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে একখণ্ড জমি কেনেন এবং নিজের ভরণ পোষণের জন্য সামান্য ব্যবস্থা করে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ডেভিড হেয়ার ছিলেন যথার্থ নাস্তিক ; কোনও রকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর ছিল না। তাঁর নাস্তিকতা ছিল স্বচ্ছন্দ, ব্যক্তিগত আচার আচরণের মধ্যে নিবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথার্থ মানবতাবাদীও। সেই জন্যেই তিনি কখনও বৌদ্ধিক ফ্যাসীবাদের পথে যেতেন না, জোর করে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না নিজের নাস্তিকতা। হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে কখনও হিন্দুধর্ম নিপাতের স্লোগান তোলেন নি। জ্ঞানের আলোকে প্রত্যেকে নিজের পথ চিনে নেবে, এই বিশ্বাসই তাঁর মনে কাজ করতো। তিনি প্রচার করতেন শিক্ষা ও সেবার কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা।

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ে ডেভিড হেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এ ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীতে 1835 খৃষ্টাব্দে কলকাতা টাউন হলে এক সভার আয়োজন করেন হেয়ার। ওই সময়ে মরিশাস ও বুরবো দ্বীপে কুলী চালানের ব্যবস্থা ছিল। জোর করে ও প্রতারণা করে কুলী পাঠানো হতো সাগরপারের ওইসব দেশে। হেয়ার এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য টাউন হলে এক সভা আহ্বান করেন। একইভাবে জুরি প্রথা প্রবর্তনের জন্যও হেয়ার জনমত সংগঠিত করেন। হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও হেয়ার যেসব সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেগুলি হলো অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ইত্যাদি।

ডেভিড হেয়ার বিদেশী ও নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাকে হিন্দুসমাজের যথার্থ হিতৈষী ও বন্ধু বলেই গণ্য করতেন। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দগতি। হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী

শিক্ষার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন নিজস্ব স্কুল, যার একটি তার নামাঙ্কিত হয়ে গৌরবজনক রূপে বর্তমান। 1842 খৃষ্টাব্দে কলেরা রোগে এই মহামানবের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়। নাস্তিকতার জন্য তাঁর দেহ খৃষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হতে পারেনি। খৃষ্টানরা তাঁকে আধা হিন্দু বলেই গণ্য করতেন। এর কারণ, নিজে খৃষ্টান সমাজের মানুষ হওয়ার সুবাদে খৃষ্টান মিশনারীদের সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। ভারত নামক সুপ্রাচীন দেশটির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মিশনারী দৈত্যরা বিনষ্ট করে দিক, এ তাঁর প্রত্যাশিত ছিল না। সেইজন্য তিনি মিশনারী ডাফের স্কুলে বাইবেল পড়া লালবিহারী দে কে নিজের স্কুলে স্থান দিতে চাননি। হেয়ারের আশঙ্কা অমূলক ছিলনা। পরবর্তীকালে লালবিহারী ডাফের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। যাইহোক ডেভিড হেয়ারের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। তাঁর মৃত্যুতে তৎকালীন কলকাতার পাঁচহাজার মানুষ শবানুগমন করেছিল। হিন্দু সমাজের আবাল বৃদ্ধ বণিতা অনুভব করেছিল নিদারুণ আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা।

ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আসার চোদ্দ পনেরো বছর পরে কলকাতায় বসবাস করতে এলেন ভারতপথিক রামমোহন রায়। অনন্য সাধারণ এই বাঙ্গালীর জন্ম 1774 খৃষ্টাব্দে। নিজের চেষ্টাতে অল্প সময়েই তিনি হিন্দুস্থানী, আরবি, ফার্সী, সংস্কৃত, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা দক্ষতা সহকারে শিক্ষা করেন। মোট এগারোটি বিভিন্ন ভাষাতে বুৎপত্তি ছিল তাঁর। শুধু ভাষাই নয়, হিন্দু, খৃস্ট, বৌদ্ধ, ইসলাম, জোরাষ্টিয়ান, ইহুদী ইত্যাদি দুনিয়ার তাবৎ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অধিকার ছিল যথেষ্ট। অধিকার ছিল হিন্দুধর্মের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রতেও। আবার বিভিন্ন ইউরোপীয় দর্শন সম্বধেও প্রচুর জ্ঞান ছিল তাঁর। হিতবাদী দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম ছিলেন তাঁর বন্ধু। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্র ও দেওয়ানী কার্যেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সব মিলিয়া একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন রামমোহন।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে দুটি ঘটনা তাঁকে আজন্ম চিন্তিত করেছিল তাহলো সহমরণ ও পৌত্তলিকতা। সহমরণ প্রথা মাত্র, এই প্রথার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন আদি জাতিকে সাংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে প্রথাটি হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতা মানুষের স্বভাব জাত। গোটা পৃথিবীতেই একসময়ে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। সদগুণের প্রতি অনুরাগই মানুষকে দেবতাতে পরিণত করে। আর মানবদেহ যেহেতু নশ্বর। জীবন্ত দেবতা

অসাক্ষাতে রূপান্তরিত হন প্রতীক-প্রতিকৃতিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যজাতির অগ্রগতির যুগে সেমীয় মিশনারীদের লেপিত পৌত্তলিকতার 'অপবাদ' পাশ্চাত্য শিক্ষায় নবশিক্ষিত হিন্দু জনমানসে এক অযথা পীড়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা হয়তো ভাবতেন পৌত্তলিকতার জন্যই হিন্দুদের রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণ। পক্ষান্তরে ধর্মীয় মতের জন্যই একেশ্বরবাদীরা বোধহয় শক্তিশালী! তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মত দেবতাকে প্রিয় ও প্রিয়কে দেবতা মনে করে তাঁরা প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজা করার মানসিক স্নিগ্ধতা অর্জন করেননি। আবার পারেনিন বিবেকানন্দের মত সদর্পে প্রতিমাপূজার পক্ষ সমর্থন করতে।

বস্তুতঃ এই প্রতিমাপূজকের অপবাদই এক দিক দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চালিকাশক্তি। পৌত্তলিকতার অপবাদ দ্বারা তাড়িত রামমোহন সর্বপ্রথম কোরাণীয় একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1803 খৃষ্টাব্দে তিনি একেশ্বরবাদের সপক্ষে ফার্সী ভাষায় রচনা করেন "তুওফাৎ উল মুওহাহিদিন" নামক এক পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন করলেও কোনও প্রেরিতপুরুষের কথা স্বীকার করেননি। এরপর রামমোহন বেদ-বেদান্ত সহ সনাতন ধর্মের নানা পুস্তক পড়ে 1815 খৃষ্টাব্দে 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন 'আত্মীয় সভা' নামে এক উপনিষদভিত্তিক একেশ্বর-বাদী সংস্থা। 'বেদান্ত গ্রন্থে' রামমোহন লিখলেন, "এক ব্রহ্ম বিণা অপরের উপাসনা করিবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন ঘোষণা করলেন কোনও ধর্মই কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয়। আবার সব ধর্মের মূলকথা একই। সেজন্য হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার প্রশ্ন নেই। তিনি সমস্ত ধর্মের নীতি, মূল্যবোধকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু বর্জন করবেন তাদের আচার, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে। তিনি যিশুর নৈতিক শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও যিশুর দিব্যত্ব স্বীকার করলেন না। 1820 খৃষ্টাব্দে তিনি যিশুর সুসমাচার সম্বলিত 'প্রিসেপ্ট অফ যেশাস' নামক একটি ত্রিভাষী পুস্তক বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষাতে রচনা করেন। এই পুস্তকে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস অস্বীকৃত হওয়াতে খৃষ্টীয় মিশনারীরা যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্ত হলো রামমোহনের ওপর।

এদিকে প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম থেকে সরে আসার জন্য হিন্দুসমাজের এক বৃহৎ অংশ রামমোহনের প্রতি রুষ্ট হয়েছিল। এর কারণ, তৎকালীন হিন্দুসমাজের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনগ্রসরতা। ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই ছিলেন সংস্কৃত পাঠে অক্ষম। যতটুকু শাস্ত্রচর্চা হতো তা নিবন্ধ ছিল ন্যায় ও স্মৃতির

মধ্যেই। লাখে পাঁচজনও বেদান্ত চর্চা করতো না। বেদ চর্চার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। কলকাতার দু একজন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণই বেদ উচ্চারণ করতে জানতেন। সুতরাং রামমোহনের মত উচ্চস্তরের বৈদান্তিককে উপলব্ধি করার সামর্থ তাঁদের ছিল না। এছাড়া তুহফাৎ উল মুওহাহিদিনের মধ্যেও কোরাণের ছায়া বড়ই স্পষ্ট। এবং ব্যক্তি রামমোহনের ভাবমূর্ত্তিও খুব উজ্জ্বল ছিল না। রামমোহনের মুসলমানী রক্ষিতা ছিল। সেই রক্ষিতার গর্ভে পুত্র রাজারাম রায় ও এক কন্যাও জন্মে। কন্যাটিকে রামমোহন হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বিবাহ দেন।[2.13] সুতরাং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ রামমোহনকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন।

রামমোহন কিন্তু তাঁর হিন্দুসত্তা মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেননি। চিরকাল উপবীত ধারণ করেছেন। বিলাতে গিয়েছেন নিজস্ব পাচক সাথী করে। কলকাতায় প্রথম লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচয়কালে বিশপ মিডলটন তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন ধরে নিয়ে উন্নততর ধর্ম গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানালে তিনি সবিনয়ে তাঁর ভুল সংশোধন করে দিয়ে জানান, এক কুসংস্কারের বদলে অন্য কুসংস্কার বরণ করার জন্য তিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করেননি।

1822 খৃষ্টাব্দে ওই বিশপের মৃত্যু হলে খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ব—অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পরমাত্মার মিলনকে কেন্দ্র করে নিজস্ব ফার্সী সংবাদপত্র 'মিরাত-উল-আখবরে' বিশপের স্মৃতি তর্পনে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, "অনিশ্চিত জগতের কষ্ট ও উৎকন্ঠা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি এখন পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর ও পবিত্র প্রেত-ঈশ্বরের বক্ষে বিশ্রাম লাভ করছেন।"

'মিরাত-উল-আখবরের' এ হেন দুঃসাহসে শুধু যে মিশনারীরা ক্ষুব্ধ হন তাই নয়, কোম্পানী সরকারও যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হন।[2.14] এর পরের ঘটনা 'মিরাত-উল-আখবরের' সহযোগী সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে ভারত থেকে বিতাড়ন এবং 1823 খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন। ফলে রামমোহন 'মিরাত-উল-আখবর' বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

পৌত্তলিকতার মত রামমোহন নাস্তিকতারও বিরোধী ছিলেন। নাস্তিকতার বদলে তিনি বরঞ্চ পৌত্তলিকতাকে মানতে প্রস্তুত ছিলেন।

সহমরণ প্রথা তৎকালীন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ভালই প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল পচাগলা কৌলিন্য প্রথা—যা কিছু পুরুষের ধর্মসম্মত বহুগামীতা ছাড়া কিছুই নয়। রামমোহন একদিকে যেমন বেদবেদান্তভিত্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার করতে সুরু করলেন, অন্যদিকে প্রচার সুরু করলেন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে। প্রচুর শাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করলেন সহমরণ প্রথা অবৈদিক।

তিনি এর জন্য অবশ্যই সরকারী আইন প্রণয়ণ চাননি। এই সহমরণ প্রথাকে কেন্দ্র করে একদল রক্ষণশীল হিন্দু তাঁর বিরুদ্ধবাদী হলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল এইসব প্রথাবিরুদ্ধ কাজকর্মের সূত্রে হিন্দুসমাজে খৃষ্টানী অনুপ্রবেশ করবে। তাঁদের আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না; রামমোহনের উত্তরসূরীরা ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় থেকে সদলবলে খৃষ্টান হওয়ার কথাও যে ভাবতেন তা 1899 খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স মূলারকে লিখিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চিঠিতেই প্রকাশ। ম্যাক্স মূলার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সদলে প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। উত্তরে মজুমদার লেখেন, প্রকাশ্যে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটু অসুবিধা আছে—এতে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম যে খৃষ্টের মূল শিক্ষার আদর্শে গঠিত এতে কোনও সন্দেহ নেই।[২.15]

এই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পাশাপাশি রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের দিকেও মনোযোগ দিলেন। কারণ তিনি বুঝলেন, ইংরেজী জ্ঞান-আহরণের ভাষা। সেই সঙ্গে শাসকদেরও মুখের ভাষা। বাঙ্গালীদের ইংরেজী শিক্ষা ঐহিক স্বার্থেও অপরিহার্য। সেজন্য তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন ইংরেজী স্কুল। এদিকে ইংরেজী শেখার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন বুদ্ধিমান বাঙ্গালীমাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে কলকাতার নানাস্থানে গজিয়ে উঠেছিল নানা প্রাইভেট স্কুল। সেইসব স্কুলের অধিকাংশেরই শিক্ষাদানের মান ছিল অত্যন্ত নীচু। তাহলে কী হবে, সেইসব স্কুলে সামান্য কয়েকটি ইংরেজী শব্দ শিখেই সাহেব কোম্পানীর দপ্তরে চাকরী জুটতো, সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যেত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গসমাজের দলপতিরা অনুভব করলেন একটি উন্নত ধরনের ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। ফলে হেয়ারের উদ্যোগে 1816 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্বকথিত হিন্দুকলেজ। হিন্দুকলেজ প্রথমে সম্পূর্ণ বেসরকারীই ছিল। পরে সরকারী আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় কিঞ্চিৎ সরকারী তদারকীর বিনিময়ে। সেই অনুযায়ী বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসন 1824 খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। পদাধিকার বলে তিনি পরিচালক সমিতির সদস্যও ছিলেন এবং পরিচালক সমিতির সভাপতিও হন। ডেভিড হেয়ার প্রথমে ছিলেন পরিদর্শক। পরে 1824 খৃষ্টাব্দে ইন্সপেক্টর ও শেষে 1825 খৃষ্টাব্দে পরিচালক সমিতির সদস্যও হয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজের যখন শৈশব অবস্থা, রামমোহন একই সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন সহমরণ প্রথা ও 'প্রতিমা পূজার' বিরুদ্ধে, ডেভিড হেয়ার প্রসারণ করে চলেছেন ইংরেজী শিক্ষা, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ নিজেদের যাবতীয় কুসংস্কার বজায় রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে দারুণ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠছে, মিশনারীরা উঠে পড়ে লেগেছে ছলে বলে কৌশলে ভারতীয়দের খৃষ্টানীকরণের জন্য, সরকার তলে তলে সমর্থন জুগিয়ে চলেছে মিশনারীদের। তখনই হিন্দু সমাজের মূর্তিমান গ্রাস, যুক্তিবাদীর ছদ্মবেশী খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদী হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর উদ্ভাস ঘটলো বণিক শহর কলকাতায়।

৩. ডিরোজিওর বাল্যকাল ও ভাগলপুর জীবন

একদিকে পর্তুগীজ হার্মাদরা, অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসা অন্যান্য ইউরোপীয়রা এদেশে এসে ইউরোপীয় নারীর অভাবে বহু এদেশী নারীর সঙ্গে আসঙ্গ লিপ্সায় জড়িয়ে পড়তেন। হিন্দুসমাজের প্রান্তের পতিতা ও অন্যান্য কুচরিত্রের নারীরাই সাধারণতঃ হার্মাদদের নর্মসহচরী হতো। এদের অনেকে আবার স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করতো খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে। অন্যদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাহেবরা অনেকে তাদের আয়া বা খানসামার কন্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেন। অনেক সাহেব আবার হিন্দুবিধবাদের প্রলুব্ধ করে কুল ত্যাগ করাতেও সমর্থ হতেন। এইভাবে ভারতে একশ্রেণীর অধিবাসীর সৃষ্টি হয় ইতিহাসে যাদের ইউরেশিয়ান বা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বলা হয়। বর্তমানে এই সম্প্রদায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত হয়। ডিরোজিওর পিতামাতা এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শ্রেণীর। পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও এক সওদাগরি কোম্পানীতে হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। মাতা ছিলেন সোফিয়া জনসন। এঁরা ছিলেন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান। ডিরোজিওর অন্যতম জীবনীকার তাঁদের পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত বলে দাবী করেছেন।

কলকাতার মৌলালী অঞ্চলে বর্তমান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের এক বাড়ীতে 1809 খৃষ্টাব্দের 18ই এপ্রিল মঙ্গলবার হেনরী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিওরা পাঁচ ভাইবোন—তিন ভাই দুই বোন। এদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন মেজো। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বল্পায়ু। কারোরই জীবন তেইশ বছরের বেশী অতিবাহিত হয়নি। বড় ভাই ফ্রাঙ্ক কুড়ি বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। বড় বোন সোফিয়া প্রয়াত হন সতেরো বছর বয়সে। ছোট ভাই গিলবার্ট অ্যাশমোরের মৃত্যু হয় মাত্র বাইশ বছর বয়সে। ছোট বোন এমেলিয়াও বাইশ বছরের বেশী বাঁচেননি।

ছ বছর বয়সে ডিরোজিও মাতৃহারা হন। এরপর ফ্রান্সিস ডিরোজিও আনা মারিয়া রিভার্স নাম্নী এক ইংরেজ বিধবাকে বিয়ে করেন। আনার কোনও সন্তান হয়নি। সতীন সন্তানদের নিয়ে সুখেই বাস করতেন তিনি।

ডিরোজিওর পরিবারে স্বচ্ছলতা ছিল। ছোটবেলা থেকেই পোষাকে-আষাকে কেতাদুরস্ত ছিলেন ডিরোজিও। নানাবিধ সোনার অলঙ্কারও শোভা পেত তাঁর

অঙ্গে। ভাল বাসতেন নাটক করতে, ক্রিকেট খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে আর সাঁতার কাটতে। খেলার সাথীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চার্লস পোট।

1815 খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ডিরোজিওর মাতা পরলোকগমন করার কিছু আগে ডিরোজিও ডেভিড ড্রামণ্ডের 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমী'তে ভর্তি হন। ডেভিড ড্রামণ্ড ছিলেন এক উদার মানবতাবাদী ও সার্থক শিক্ষক। তিনি সহকর্মী মেজার্সকে সঙ্গে নিয়ে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গেই ছেলেদের ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সী, বাংলা ইত্যাদি ভাষা এবং জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, হিসাবশাস্ত্র, ভূগোল এবং অঙ্কন শেখাতেন। স্কুলে ছিল কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা। শিক্ষাদানের জন্য সেখানে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হতো। ভূগোল পড়াবার জন্য ব্যবহৃত হতো গ্লোব। নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হতো বহিরাগত পরীক্ষকদের দ্বারা। সেকালের কলকাতার কৃতবিদ্য সাহেবরাই পরীক্ষক হয়ে আসতেন। যথাযথ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যও পড়ানো হতো। শেখানো হতো আবৃত্তি ও নাচও। পরবর্তীকালের কবি ডিরোজিওর বীজ এভাবে বপন হয়েছিল ড্রামণ্ডের স্কুলেই।

ডিরোজিওর অন্যতম জীবনীকার বিনয় ঘোষ বিনা তথ্য প্রমাণে ড্রামণ্ডকে ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' পুস্তকে। কিন্তু সুবীর রায়চৌধুরী[৩·1] তথ্যপ্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন ড্রামণ্ড মোটেই সংশয়বাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান। নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে তিনি ধর্মশিক্ষাও দিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ড্রামণ্ড ছিলেন একজন কবি। একটি কাব্যসংকলনও তিনি প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। সেজন্য নানা বিতর্কসভায় তাঁর ডাক পড়তো। 'উইকলী একজামিনার' বলে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

এহেন আকর্ষণীয় চরিত্রের কৃতবিদ্য শিক্ষকের কাছে প্রভূত কৃতিত্বের সঙ্গে আটবছর শিক্ষালাভ করেন ডিরোজিও। ফলে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভা যথাযথভাবে বিকশিত হয়। ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। বিধিবদ্ধ পড়াশুনা ছাড়াও অভিনয়, আবৃত্তি, কবিতা রচনা ইত্যাদি শিক্ষাসূচী উত্তর কর্মকাণ্ডে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। সহপাঠীদের মধ্যেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল শিখরচুম্বী। একবার দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর অবেলায় স্কুলে এলে সহপাঠীরা- ক্লাশ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য।

ছাত্রাবস্থায় ডিরোজিও একটি নাটকও লেখেন।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ড্রামণ্ডের স্কুলে ডিরোজিওর প্রথাগত শিক্ষাজীবন শেষ হয়। তার কারণ সমকালীন কলকাতাতে একজন ইউরেশীয়ের কাছে প্রথাগত ভাবে এর থেকে বেশী শিক্ষালাভের সুযোগ ছিলনা। তবে মেধাবী ছাত্রের শিক্ষার জগত তো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়; নিজের প্রচেষ্টায় সেই বয়সেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন ডিরোজিও। সেই পাণ্ডিত্যের অসামান্য প্রকাশ দেখা গেল পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের শিক্ষকতায়।

কিন্তু ডিরোজিওর প্রিয় বিষয় কী ছিল? তাঁর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস জানিয়েছেন—সাহিত্য এবং ইংলণ্ডের চিন্তাজগত—যা ওই দেশের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং দার্শনিকদের রচনায় বিধৃত।[৩.২]

ডিরোজিওর কর্মজীবনের সূচনা পিতার অফিস জেমস স্কট অ্যাণ্ড কোম্পানীতে। তাঁর পিতা এই কোম্পানীতেই চীফ অ্যাকাউণ্টাণ্ট-এর চাকরী করতেন। কিন্তু যে পরবর্তী জীবনে কবি হবে, সাংবাদিক হবে, শিক্ষক হবে, তার এই হিসাব রক্ষকের কাজ আর কদিন ভাল লাগতে পারে? এক-দুবছর কাজ করার পর ডিরোজিও এই চাকরী ছেড়ে চাকরী নিলেন ভাগলপুরের এক নীলকরের দপ্তরে। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন ডিরোজিওর এক আত্মীয়— সম্পর্কে একই সঙ্গে মামা ও পিশে। বণিকের শহর কলকাতা থেকে দূরে ভাগলপুরের সন্নিকটে তারাপুরের উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁর কাব্যচর্চার শুরু হয়। কারো কারো মতে তিনি এসময়ে এক মহিলার প্রেমেও পড়েন। তাঁর প্রথম দিককার কবিতাগুলি ছিল প্রায়শই প্রণয় ঘটিত।

1825 খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ডিরোজিও কলকাতার 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকাতে কবিতা পাঠাতে সুরু করেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' সম্পাদক ডাঃ জন গ্রাণ্ট ছিলেন ডিরোজিওর কবিতার প্রধান উৎসাহদাতা। লেখালেখি করার সময় ডিরোজিও নানারকম ছদ্মনাম ব্যবহার করতেনঃ জুভেনিস, হেনরী, ইউরেশিয়ান প্রভৃতি। 'ক্যালিডোস্কোপ' পত্রিকায় ডিরোজিও লিখিত 'To my Pupils' সনেটের কবি হিসাবে শুধুমাত্র D অক্ষরটি দেখা যায়।

ভাগলপুরে যে কাব্যচর্চার সুরু তা ক্রমশঃ পল্লবিত হয়। 1827 খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করার সময়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েমস' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থঃ দি ফকীর অফ জঙ্ঘীরা; এ মেট্রিক্যাল টেল অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস। সে আমলে ডিরোজিওর কবিতাকে মূলতঃ সম সময়ে জনপ্রিয় বায়রণ, মুর, ল্যাণ্ডন প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের অনুকৃতির প্রয়াস হিসাবেই গণ্য করা হতো। বস্তুতঃ ডিরোজিও 'ভারতীয় বাইরন' বলে অভিহিত হতেন।বর্তমানে

সেকুলার আলোচকদের[3.3] বদান্যতায় কবি হিসাবে ডিরোজিওর যথেষ্ট পদোন্নতি ঘটেছে। পল্লব সেনগুপ্ত ডিরোজিওর কবিতাকে পাঁচটি ধারায় বিভক্ত করেছেন: ভারতীয়, ইউরোপীয়, সর্বমানবীয় এবং বিচিত্র। তাঁর ফকির অফ্ জঙ্ঘীরা ও তাঁর উৎসর্গ কবিতা—টু ইণ্ডিয়া, মাই নেটিভ ল্যাণ্ড এবং হার্প অফ ইণ্ডিয়ার মধ্যে ভারতীয়ত্ব খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক সমালোচক। 'দি হার্প অফ ইণ্ডিয়া' হচ্ছে স্বদেশ চেতনার দ্যোতক। তেমনই স্বদেশ চেতনার কবিতা, 'টু ইন্ডিয়া-মাই নেটিভ ল্যাণ্ড'।

ডিরোজিও ভারতে জন্মেছিলেন; ভারতের জল হাওয়ার মধ্যেই বড় হয়েছিলেন, অন্যদিকে ইউরোপীয়রা ইউরেশীয়দের ঘৃণার চোখেই দেখতো। 1784 খৃষ্টাব্দ থেকে পর্তুগীজ, বা পর্তুগীজ বংশজাত, বা দেশীয় রমণীর গর্ভজাত ইংরেজ সন্তানরা ইষ্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর কাজেকর্মে অচ্ছুৎ হয়ে যায়। এক আদেশবলে ইউরেশীয়দের বিলেত গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। 1792 খৃষ্টাব্দে আর এক আদেশবলে তাদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় স্থল ও নৌবাহিনীতে। 1795 খৃষ্টাব্দে আইনটি একটু সংশোধন করে তাদের শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর ব্যাণ্ডপার্টিতে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা অর্পণ করা হয়। 1798 খৃষ্টাব্দে মারাঠা ও টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ইউরেশীয় সৈন্য নেওয়া হয়। পরে যুদ্ধ মিটে গেলে 1808 খৃষ্টাব্দ থেকে আবার জারী হয় পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞা।

এই যখন ইউরেশীয়দের অবস্থা তখন কোনও এক সূত্রে ইউরোপীয় রক্ত ইউরেশীয়দের মধ্যে প্রবাহিত হলেও ডিরোজিওদের ভারতকে স্বদেশ বলে চিন্তা করা ছাড়া উপায় কী? ডিরোজিও নিঃসন্দেহে ভারতকে স্বদেশ বলেছিলেন। বলেছিলেন:

আমি ভারতে জন্মেছি; এখানেই বড় হয়েছি। আমি আমার দেশকে স্বীকার করে গর্বিত, তার সেবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবো।[3.4]

তবে কোন স্বদেশ ডিরোজিওর আকাঙ্খিত ছিল সেটাই গবেষণার বিষয়। ভারতীয় পরম্পরা সম্পর্কে ডিরোজিও অবহিত ছিলেন বলে পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী আচরণ সম্পর্কেও তাঁর নাকি কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। বেদ সম্পর্কেও ডিরোজিও 'গভীর অনুধাবন' ছিল তার প্রমাণ নাকি 'ফকীর অফ জঙ্ঘীরা' নামক আখ্যানকাব্যে পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন পল্লব সেনগুপ্ত। কিন্তু এই ভারতীয় পরম্পরা সম্পর্কে কি কোনও শ্রদ্ধাবোধ ছিল হেনরী ডিভিয়ান ডিরোজিওর?

যে মিশনারী উইলিয়াম কেরী, যাঁর কাজই ছিল হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে সর্বদা ভূলুণ্ঠিত করা, তিনিও মূল সংস্কৃত মহাভারত পাঠ করে 1796 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বন্ধুকে লিখেছিলেন, আমি সুন্দর ভাষায় লেখা মহাভারতের বেশ কিছু অংশ পড়েছি, যা হোমারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। হোমারের ইলিয়াডের মত এও মানুষের প্রতিভাকৃত মহান শিল্পকর্ম ঃ পৃথিবীর সুন্দরতম শিল্পকর্মের অন্যতম। [3.5]

আর ওয়ারেন হেষ্টিংস, ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার করার জন্য জন্মভূমিতে যিনি 'ইমপীচড' হয়েছিলেন, সেই ওয়ারেন হেষ্টিংস 1784 খৃষ্টাব্দের 20 শে নভেম্বর স্ত্রীকে লিখিত পত্রে[3.6] পরম শ্রদ্ধাভরে গীতার ব্যাখাত নিষ্কাম কর্মযোগের আলোচনা করছেন এবং মহাভারত থেকে রুরু ও প্রমদ্বরার উপাখ্যানটির কাব্যরূপ দিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য পাঠাচ্ছেন। এর কিছুদিন আগেই 4 ঠা অক্টোবর ন্যাথানিয়েল স্মিথকে এক চিঠিতে গীতা সম্পর্কে লিখেছেন," I hesitate not to pronounce the Geeta, a performance of great orginality ; of a sublimity of conception, reasoning and diction, almost unequalled ; and a single exception, among all the known religions of mankind, of a theology accurately corresponding with that of Christian dispensation, and most powerfully illustrating its fundamental doctrines."

চিঠির শেষে তিনি বলেছেন, ভারতে বৃটীশ শাসনের অবসান ঘটবে, কিন্তু তার দীর্ঘকাল পরেও হিন্দু সাহিত্যের এইসব চিরন্তন সৃষ্টি বেঁচে থাকবে।[3.]

ডিরোজিওর কলম থেকে কি ভারতীয় পরম্পরা সম্বন্ধে এ ধরনের শ্রদ্ধাবোধ নিঃসৃত হয়েছে কদাচ ?

ইউরোপীয় ও খৃষ্টীয় মস্তিষ্কের ডিরোজিওর 'স্বদেশ চেতনা' যা নাকি তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে পরে আলোচনা হবে। এখন উদ্ধৃত করা যাক সেই 'স্বদেশ চেতনাদ্যোতক' কবিতাদুটি ঃ

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou

Thy minstrel hath no wreath to weave for thee.
Save the sad story of misery !
well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! One kind wish for thee !

এই কবিতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ ঃ

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় ! সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে,
কোথায় সে বন্দ্য পদ ! মহিমা কোথায় !
গগণবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় !
বন্দিগণ বিরচিত গীতি উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ !
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি !

THE HARP OF INDIA

Why hang'st them lonely on your withered bough ?
Unstrung for ever, must thou there remain ?
Thy music once was sweet—who hears it now ?
Why doth the breeze sigh over thee in vain ?
Silence hath bound thee with her fatal chain ;
Neglected, mute, and desolate art thou
Like ruined monument on desert plain :
O ! many a hand more worthy far than mine

Once thy harmonious chords to sweetness gave,
And many a wreath for them did Fame entwine
Of flowers still blooming on the minstrel's grave
Those hands are cold—but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my county, let me strike the strain !

উভয় কবিতার সুন্দর বঙ্গানুবাদ পল্লব সেনগুপ্তর বইতে আছে।

৪. ড্রোজু হেঙ্গাম

1826 খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' সহ-সম্পাদকের চাকরী নিয়ে কলকাতায় এলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেটের' সম্পাদক ডাঃ গ্রাণ্টের সঙ্গে ডিরোজিওর আগে থাকতেই সুসম্পর্ক ছিল। গ্রাণ্টের পত্রিকাতেই যে ডিরোজিওর কবিত্বের হাতে খড়ি তা আগেই জেনেছি। ওই বছরেই নভেম্বর মাসে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতায় যোগ দেন। অনেকের ধারণা, হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটের চাকরীও বজায় রাখেন। তবে লিখিত পড়িতভাবে ইণ্ডিয়া গেজেটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকলেও অলিখিতভাবে তিনি যে ইণ্ডিয়া গেজেটের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়না। ইতিমধ্যেই হিন্দু কলেজ পটলডাঙ্গায় তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দেন চতুর্থ শিক্ষক হিসাবে। মাসিক বেতন 150 টাকা। তাঁকে পড়াতে হতো দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে। পাঠ্যবিষয় ছিল ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস। পাঠ্যতালিকায় ছিলঃ গোল্ডস্মিথের গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, রাসেলের আধুনিক ইউরোপ, রবার্টসনের পঞ্চম চার্লস, গে'র উপকথা, পোপ অনুদিত হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি, ড্রাইডেনের 'ভার্জিল' মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট,' সেক্সপীয়ারের যে কোনও একটি ট্র্যাজেডী। শিক্ষক হিসাবে অত্যন্ত সফল ছিলেন ডিরোজিও। একথা হোরেস হেম্যান উইলসন যেমন স্বীকার করেছেন বারবার, তেমনই অনুভব করেছেন তাঁর বিরুদ্ধবাদী হিন্দু রক্ষণশীলরাও। তখন সবেমাত্র সতেরো বছর বয়স। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল সামান্যই। কেউ কেউ ছিলেন তাঁর সমবয়স্ক।

ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (1814-78), রামগোপাল ঘোষ (1815—68), প্যারীচাঁদ মিত্র (1814—83), রাধানাথ শিকদার (1813—70), রামতনু লাহিড়ী (1813—98), শিবচন্দ্র দেব (1811—90), দিগম্বর মিত্র (1817—79), গোবিন্দচন্দ্র দেব প্রভৃতি। হরচন্দ্র ঘোষ (1809—68), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (1813—85), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (1810—58) সেই অর্থে ডিরোজিওর ছাত্র না হলেও ছাত্র প্রতিম। ডিরোজিওর ভাবধারার আর এক বাহক হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (1806—57)। তিনি ছিলেন রামমোহনের অনুগামী এবং ডিরোজিওর

ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহন-সংস্কারপন্থীদের সংযোগসূত্র। অন্যদিকে রামমোহন স্থাপিত ব্রহ্মসভার (1828) প্রধান সম্পাদকও। প্যারিচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র (1822-73) বয়সে অনেক ছোট হলেও ডিরোজিওর ছাত্রদের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

ডিরোজিও শিক্ষাদান কর্মটিকে শুধুমাত্র ক্লাশঘর ও সিলেবাসের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন বঙ্গসমাজের সবচেয়ে তরতাজা সদস্যগুলির শিকড় হিন্দুসমাজ থেকে উৎপাটিত করতে। শিকড় উৎপাটন করা সুস্বাস্থ্যের চারাগাছগুলিকে যাতে খৃষ্টধর্মের স্রোতের মধ্যে ভিড়িয়ে দেওয়া যায়। কারণ কনষ্টানটাইনের যুগ বড় পুরাতন। অ্যালবুকার্ক-ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইতিহাসের বস্তু। শিক্ষার আলোক ও নানারকম প্রলোভন ছড়িয়ে, হিন্দুধর্ম-সমাজ-সাহিত্যকে অকথ্য গালিগালাজ করেও কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডরা ব্যর্থ হিন্দুদের খৃষ্টান করতে।

কোনও হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা যে সহজ ব্যাপার নয় সেকথা মিশনারীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। শিক্ষিত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ তা স্বীকার করে ছিলেন। পাদ্রী জি ম্যাণ্ডী বলেছেন, পঞ্চাশ বছর ধরে মিশনারীরা কায়মনোবাক্যে প্রচার করলেও তাদের ধনব্যয়ের ও পরিশ্রমের সমানুপাতে ফল পাওয়া যাচ্ছে না।[4.1] হিন্দুদের খৃষ্টান করার চেষ্টা যে অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অপকারী একথা কর্নেল ষ্টুয়ার্ট 1808 খৃষ্টাব্দেই বলেন। হিন্দুদের খৃষ্টানকরার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে সব পুণ্যবান সুসমাচার প্রচারকেরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য ভারতে যান তারা অবশ্যই চার্চের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁদের উদ্যম অপাত্রে প্রযুক্ত, তাঁদের পরিশ্রম ব্যর্থই হবে। সামান্যতম সম্ভ্রমযুক্ত হিন্দুরা কখনই তাদের উদ্যমের কাছে নতিস্বীকার করবে না।[4.2]

সুতরাং যুবক ডিরোজিও সম্প্রসারণবাদী খৃষ্টানীর স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা বশতঃ এক খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেন—একমাত্র যে সাম্রাজ্যের মধ্যেই তাঁর ইউরেশীয় সমাজের নিরাপত্তা নিহিত। কিন্তু ছদ্ম মিশনারীর গায়ের জোব্বাটি রইলো যুক্তিবাদীর। তিনি ছাত্রদের শোনালেন হিউমের যুক্তিবাদ, লক, রীড, ডুগাল ষ্টুয়াটের দর্শন। বিধিবদ্ধ ক্লাশের বাইরেও ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগলেন। বাড়ীতেও ডেকে নিয়ে যেতে লাগলেন ছাত্রদের; বিতর্ক, আলোচনা সভা, পত্রপত্রিকা পাঠ ইত্যাদিতে উৎসাহ যোগাতে লাগলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: তিনি কলেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কলেজের অধ্যক্ষরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালীস্থ বাসায় উপদেশ

দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্ররা এমনই তাঁহাকে ভালবাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল।[4.3]

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিও ছিলেন সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় সর্ব বিষয়ের খোলাখুলি আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রেরণাদাতা। তিনি স্বয়ং ছিলেন মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং প্রিয়ভাষী। তিনি ছাত্রদের কাছে এসে মন খুলে কথাবার্তায় উৎসাহ দিতেন। হিন্দু-কলেজের উপরের ক্লাশের ছাত্ররা প্রায়ই টিফিনের সময়ে, স্কুলের পরে তাঁর বাড়ীতে সঙ্গলাভের জন্য আসতেন। তিনি প্রত্যেককেই উৎসাহিত করতেন নিজ নিজ বক্তব্য জানানোর জন্য। এর ফলে খোলাখুলিভাবে মনের আদান প্রদান ঘটতো এবং এমন সব বই পড়া হতো যা সচরাচর পড়া হওয়ার কথা নয়। এই বইগুলি প্রধানতঃ ছিল কাব্য, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক।[4.4]

ডিরোজিও শিষ্য শিবচন্দ্র দেব তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন "যখন আমি ডিরোজিওর শিক্ষাধীন হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তাম তখন তার পথপ্রদর্শনায় কলেজ ও কলেজের বাইরে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা হতো। তাঁরই ফলস্বরূপ আমার হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জন্মায় এবং আমি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী (Deist) হয়ে উঠি।[4.5]

1828 খৃষ্টাব্দে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হলো। এই অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনগুলিতে দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুশীলন হতে লাগলো। আলোচনার বিষয় থেকে প্রতিমাপূজা, জাতিভেদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি কোনও কিছুই বাদ যেত না। অ্যাসোসিয়েশনের কার্যবিবরণী সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের তৎকালীন কেরানী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, হিন্দুধর্মের নীতি ও আচরণগুলিকে খোলাখুলিভাবে বিদ্রূপ করা হতো···হিন্দুধর্মকে দুয়ো দেওয়া হতো নীচ, দুর্নীতিযুক্ত এবং অযৌক্তিক বলে।[4.6]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ধাঁচে কলকাতায় আরও সাতটি বিতর্কসভা গড়ে উঠলো। এর সবগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট রইলেন ডিরোজিও। তাঁর অনুপ্রাণিত তথাকথিত যুক্তিবাদী সমালোচনার মূল লক্ষ ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার সমূহ—যদিও হিন্দুধর্ম ও দর্শন বা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন

সম্পূর্ণ অজ্ঞ। খৃষ্টধর্মের কোনও তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা অ্যাসোসিয়েশনের কোনও মঞ্চে হতো, এরকম খবর নেই। কারণ ডিরোজিওর কাছে খৃষ্টধর্মের সত্যতা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। এর সমস্ত বিশ্বাসই ছিল আদর্শ। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা অবশ্যই অ্যাসোসিয়েশনের সভাতে হতো না।

আধুনিক সেকুলার আলোচকরা নানারকম মিথ্যা তথ্য দিয়ে ডিরোজিওর নাস্তিকতা প্রতিপন্ন করতে তৎপর। কিন্তু 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহন লিখেছেন, "ডিরোজিও কদাচ বলেননি তুমি নাস্তিক হও। উচ্ছৃঙ্খল হও। বরং বলেছেন, তুমি জিজ্ঞাসু হও। উচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর জীবনের প্রয়োজন বোধকে স্থাপন করো। নাস্তিকতা বড় মূল্যবোধের পরিপন্থী"।[4.7] এছাড়া যুক্তিবাদ কথাটি রক্তে বেশ উষ্ণতা সঞ্চার করে। কিন্তু যুক্তি একটি পদ্ধতি মাত্র। তথ্যের ওপর যুক্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত আহরণ করতে হয়। তথ্য অপ্রচুর ও মিথ্যা হলে সিদ্ধান্তও খণ্ডিত সত্য বা মিথ্যা হয়ে যায়। সততই নিত্য নতুন তথ্য আহরিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সিদ্ধান্তও। তাই নিউটনের যুগে যা সত্য ছিল, হাইজেনের যুগে তা পরিবর্তিত হলো। আবার হাইজেনের সত্য পরিবর্তিত হলো ম্যাক্স প্লাঙ্কের যুগে। এ তো প্রকৃতি বিজ্ঞানের কথা। সমাজবিজ্ঞানের সত্য আরও বেশী কুয়াসাচ্ছন্ন। কারণ সমাজবিজ্ঞানের মূলবস্তু মানুষের মন।

তাই প্রশ্ন, যুক্তিবাদী ডিরোজিও সেদিনের হিন্দুসমাজ মন্থন করে কী সত্য আহরণ করে তুলে দিয়েছিলেন অপরিণত-বয়স্ক ছাত্রদের হাতে? যে যুগে সমস্ত হিন্দুসমাজ স্মৃতির চোরাবালির মধ্যে নিবদ্ধ সেই যুগে তাঁর কিশোর ও যুবক ছাত্রদের কাছে বেদ থেকে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিশাল বহুবর্ণময় বর্ণালীটি কি মেলে ধরেছিলেন ডিরোজিও? না, মেলে ধরেছিলেন খৃষ্টধর্মের সমগ্র ইতিহাসটি? আলোচনা করতেন কি ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা আদিম পাপের তত্ত্ব নিয়ে? প্রশ্ন তুলেছিলেন কী সাতদিনে পৃথিবী সৃষ্টি সম্ভব কি না? বা কীভাবে একটি শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আদম ঈভের পাপের দ্বারা গ্রস্ত হবে? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কি ব্যাখ্যা করেছিলেন বৈদিক যুগ থেকে সমসময় পর্যন্ত হিন্দুদের ইতিহাস? করেননি। কারণ, তা করার পরে শুধুমাত্র হিন্দুত্বকে ঘৃণা করা যেত না, ফলে সব ডিরোজিও শিষ্যই রাধানাথ শিকদার হতো। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন, দক্ষিণারঞ্জনকে পাওয়া যেত না। জগৎছাড়া নাস্তিকের দেশ হতো ভারত।

আসলে ডিরোজিও তৎকালীন প্রচলিত বহুবিবাহ, সহমরণ ইত্যাদি

কুপ্রথা আর কবিগানের খিস্তিখেউড়, দুর্গাপুজোর সময়ে বাঈজী নাচ ইত্যাদিকেই হিন্দুধর্ম বলে চিহ্নিত করে পরিবেশন করেছিলেন কোমলমতি ছাত্রদের কাছে। এছাড়া তাঁর ছিল সেমীয় পৌত্তলিকতা বিদ্বেষ। এরই ফলে ঘূর্ণিত হয়েছিল ছাত্রদের মস্তক।

আর লক হিউমের দর্শন? অশিক্ষার পালাজ্বর থেকে সদ্য উঠে আসা পটলডাঙ্গার প্যালারামের পক্ষে কি হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ গোমাংসের সঙ্গে টেনিদা পরিবেশিত লক-হিউম রূপ বিরিয়ানী হজম করা সহজ? বদহজমের বিরিয়ানির কুফল, প্যালারামদের পিতৃপুরুষের যাবতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও ইতিহাসের প্রতি বিরূপতা। আর পৌত্তলিকতা? পৌত্তলিকতা নিয়ে কোনও রকম বিচার বিবেচনা করা সম্ভব নয় সম্প্রসারণবাদী সেমীয় একেশ্বরবাদীদের পক্ষে। পৌত্তলিকতা থাকলে আব্রাহামের বংশধররা বিস্তার লাভ করেনা! সুতরাং রাজনৈতিক কারণেই পৌত্তলিকতার নিন্দা করতে হয় ডিরোজিওদের।

ছাত্রদের মস্তক ঘূর্ণনের আর একটি কারণ হলো, শিক্ষকগৃহে ভগ্নী এমেলিয়ার স্বচ্ছন্দ গতি। আগেই আমরা জেনেছি, ছাত্ররা অবসরে প্রায়ই ডিরোজিওর গৃহে উপস্থিত হতেন। সমসময়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কিশোরদের কাছে তাদের ভগ্নীরাও স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। নিতান্ত বালিকা বয়সেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত এবং বালবিধবা ভগ্নীরা গৃহে ভ্রাতাদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এমত অবস্থায় শিক্ষকগৃহে ইউরেশীয় সমাজের স্বচ্ছন্দচারিনী এমেলিয়া অবশ্যই খৃষ্টীয় সমাজ সম্বন্ধে কিশোরদের মনে মোহের সৃষ্টি করতো। সুতরাং বাস্তবতার খাতিরে ছাত্রদের ডিরোজিও অনুরক্তির পশ্চাতে এমেলিয়ার ক্ষুদ্র ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। ব্যাপারটা নিতান্তই নান্দনিক। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, তিনি কেবল ছুটির পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না, তাহাদিগকে অপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্যভাবে মিলিতেন, নিজের জননী এবং ভগিনী এমেলিয়ার সহিত তাহাদিগের পরিচয় করিয়া দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য করিতেন।[4.৪]

মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, ডিরোজিও বাটীর সন্নিকটে অবস্থান কালে দক্ষিণারঞ্জন প্রায়ই ডিরোজিওর ভবনে আগমন পূর্বক সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। ডিরোজিওর সুশিক্ষিতা ও স্নেহময়ী সহোদরা এমেলিয়া দক্ষিণারঞ্জনকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন।[4.৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এমেলিয়া ও দক্ষিণারঞ্জন প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। আর শুধু এমেলিয়া নয়, পশ্চিমী সমাজ সম্পর্কে ডিরোজিও ছাত্রদের মোহগ্রস্ত হবার অন্য

আকর্ষণও থাকতো। দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপীয়দের ভবনেও মাঝে মাঝে ডিরোজিও শিষ্যদের নিমন্ত্রণ জুটতো এবং সেখানে গৃহকর্তার সুন্দরী কন্যাদের হাত দিয়ে শেরী-শ্যাম্পেনও যে এগিয়ে আসতো সদ্য গোঁফ উঠা হিন্দু কিশোরদের পানে, সেকথা শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন।[4.10]

যাইহোক, ডিরোজিও ছাত্রদের বদহজমের ভেদবমির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ছিল হিন্দুসমাজের সমগ্র পরিমণ্ডলে। অবস্থার ত্রস্ত বর্ণনা রয়ে গেছে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়, রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিচারণায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রাজতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী ডিরোজিও শিষ্যদের সম্বন্ধে লিখেছেন, তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাই গো আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চিৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের ছাদে বসিয়া প্রতিবেশীকে ডাকিয়া বলিত, এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি—এই বলিয়া পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে পুরিয়া দিত।[4.11]

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের ওপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারের নিকট গিয়া বলিতেন, গোরু খেতে পারিস? গোরু খেতে পারিস? এইরূপে প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রনা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েকদিন মন্ত্রনাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ না করিয়া পথের উপর সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয়না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গীগণ তিনবার গগনভেদী স্বরে "Hip! Hip! Hurrah!" বলিয়া উঠিলেন। তাহারা ঐ কাজকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন।[4.12]

রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন, একজন ইয়ংবেঙ্গল বলিতেন,

প্রত্যহ এ বেলা অর্ধসের আর ওবেলা অর্ধসের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনও বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্যে তাহাই করিতেন। এভারেস্টের উচ্চতা পরিমাপক এই গণিতজ্ঞ বাঙ্গালীর শেষ পরিণাম সম্বন্ধে বলেছেন. পরিশেষে এক ত্বাচ (চর্ম) রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমনই অসুস্থ হইয়া পড়িল যে পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন।[4.13]

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দুসমাজ নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল।"[4.14]

ডিরোজিও শিষ্যদের সমাজ বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিনের' বক্তব্য ছিল, ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্ররা শূকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে প্রগতির পথ খুঁজছিলেন এবং বিয়ারের গ্লাসের মধ্য দিয়ে উদারনীতির দিকে এগোচ্ছিলেন।[4.15]

নব বঙ্গীয়দের গোমাংসপ্রীতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু একটি গল্প ফেঁদেছেন। যদিও গল্প গল্পই ; কিন্তু তা সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন নিশ্চয় ঃ

"একবার উইলসনের হোটেলে দুই বাঙ্গালীবাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বীল হ্যায়।"[4.16]

খানসামা উত্তর করিল, "নহি হ্যায় খোদাওন্দ।"

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীফষ্টীক হ্যায় ?"[4.1]

খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।"

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্‌সটং হ্যায় ?"[4.1]

খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।"

বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফ্‌স ফুট জেলী ?"[4.19]

খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।"

বাবু বলিলেন, "গোরুকা কুচ্‌ হ্যায় নহি ?"

এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয়বাবু, যিনি গোমাংসপ্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে ! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে তো খানিকটা গোবর এনে দে না !"

আজকালের বাঙ্গালীরা ডিরোজিও শিষ্যদের মত গোমাংস ভক্ষণকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত বলে মনে করেন। হিন্দুদের কাছে শুধু গোমাংস-ভক্ষণ নয়, গোহত্যাও নিন্দনীয়। কিন্তু কেন ? এটা কী টোটেম-ট্যাবু ঘটিত ব্যাপার ? গরু কী হিন্দুদের টোটেম যে তাকে বধ করা ট্যাবু ?

না, গরু একসময়ে আর্যদের ভক্ষ্য ছিল। ঋকবেদে গোমাংস আহুতি

দেওয়ার কথা আছে, আবার গরুকে অঘ্ন্যাও বলা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে পৌরাণিক রাজা রন্তিদেবের কথা। রন্তিদেব অতিথিসেবা করতেন শত শত গোহত্যা করে। একদা আর্যরা যখন অরণ্যচারী খাদ্য সংগ্রাহক ছিলেন তখন গরু ছিল ভক্ষ্য। পরে আরণ্যক সভ্যতা যখন কৃষি সভ্যতায় রূপান্তরিত হতে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে গরু ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ হতে থাকে মানুষের। গরু হয়ে ওঠে পরিবারের অত্যাবশ্যক সদস্য। পরিবারের মধ্যে সন্তানস্নেহে পালিত হতে থাকে গরু। গরুর প্রতি এই স্নিগ্ধতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাহিত্যে, মহাকবি কালিদাসের নন্দিনী বর্ণনার মধ্যে। ভারতীয়দের গরুর প্রতি স্নিগ্ধতা তুলনীয় হতে পারে ইংরেজদের কুকুর প্রীতির সঙ্গে। ইংলণ্ডের কেল্টীয় উপজাতিদের শিকারের সাথী ছিল নেকড়ে বংশোদ্ভূত দুর্দান্ত স্বভাব কুকুরেরা। সেই উপজাতিরা যখন সভ্য হলো তখন শিকারের একদা সাথীদের তারা ভুললোনা। সভ্য ইংরেজ পরিবারের অত্যাবশ্যক সদস্য তার পালিত কুকুরটি। সেটিকে সে পুত্রস্নেহে পালন করে। পুত্রের মতই কুকুরের একটি নাম থাকে। হিন্দুগৃহে যেমন গাভীর নাম হয় কাজলী, ধবলী, রাঙ্গী ইত্যাদি। দ্বৈতবাদী খৃষ্টান ইংরেজরা কুকুরকে সন্তানের অধিক ভাবতে পারে না। কিন্তু অদ্বৈতবাদী হিন্দুরা ধবলী-কাজলী-নন্দিনীকে অনায়াসে দেবীত্বে উন্নীত করে। পৌরাণিক যুগে গরু স্থানলাভ করে নানা মন্ত্রে। সুতরাং হিন্দুমনের গোভক্তি সুকুমার প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক। সুকুমার প্রবৃত্তি যদি কুসংস্কারের হয় তাহলে তো বর্বরতাকেই সুসংস্কার বলতে হয়! প্রাণী হত্যা বর্বরতার অঙ্গ। খাদ্যনীতির সঙ্গে কোনও রুচি জড়িয়ে নেই। জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও অর্থনীতি। ভারতের মত উর্বর দেশের অধিবাসীদের পক্ষেই নিরামিষাশী হওয়া সম্ভব। এখানে শিকারের পিছনে কষ্টসাধ্য ধাওয়া থেকে বিরত হয়েও খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। যেখানে কৃষিকার্য সম্ভব নয়, সেখানকার অধিবাসীরাই কষ্টসাধ্য শিকারের দ্বারা খাদ্য আহরণ করতে বাধ্য। ফলতঃ তারা মাংসাশী। নিত্য যাদের শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, তারা কৃষিসভ্যতার মানুষদের থেকে তুলনামূলকভাবে উগ্র স্বভাবের হওয়াই স্বাভাবিক। অতিকতর প্রাণিজ প্রোটিন যে মানুষকে উগ্র স্বভাবের হতে সাহায্য করে তা এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত। বর্তমানে পশ্চিমী জগতের মানুষেরা স্বাস্থ্যের কারণেই উচ্চ প্রোটিন যুক্ত পশুমাংসে অনীহা প্রকাশ করছেন।

সেমীয় একেশ্বরবাদীরা এদেশে এসে সহজেই হিন্দুদের গোপ্রীতি অনুধাবণ করে। এই গোপ্রীতিকেই হিন্দুদের দুর্বলতম স্থান বিবেচনা করে জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলিম মৌলবাদী সেখ আহমদ শিরহিন্দী ঘোষণা করেন, হিন্দুস্থানে

গোহত্যাই মুসলমানদের পবিত্রতম কর্তব্য। কারণ, হিন্দুরা গোহত্যার বদলে সারাজীবন ধরে জিজিয়া কর দিতে রাজী।[4.20] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইসলামে গোহত্যা ফর্জ বা অবশ্যপালনীয় নয়।

তীক্ষ্ণধী ডিরোজিও সেখ আহমদ শিরহিন্দীর মতই সহজে বুঝে নিয়েছিলেন, গোমাংস ভক্ষণই হিন্দুদের আঘাত করার সর্বশ্রেষ্ট উপায়। বন্ধু ভাবাপন্ন ছাত্রদের সঙ্গে নিজ ভবনে ও অন্যত্র তিনি আহার করতেন। আহারকালীন গোমাংস ভক্ষণ না করাকে তিনি সুকৌশলে কুসংস্কার রূপেই চিহ্নিত করতেন স্বভাবতই। এতে সন্দেহ করার কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডেভিড হেয়ার কোনও ছাত্রকে নিজস্ব পাকশালার খাদ্য আহার করতে দিতেন না। প্রয়োজনে বাইরের মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে খাওয়াতেন, শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু জীবনীতে লিখে গেছেন একথা।

পরবর্তীকালে আমরা দেখবো এই গোমাংস ভক্ষণের পরিণতিতেই প্রথম শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্মের দিকে পা বাড়াতে একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন। তিনি পথপ্রদর্শন না করলে পরবর্তীকালে একঝাঁক শিক্ষিত হিন্দুসন্তান খৃষ্টধর্মের দিকে অগ্রসর হতেন কিনা সন্দেহ।

যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদকে ডিরোজিও পোষাক হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, একজন ইউরেশীয় হিসাবে তাঁর অবস্থান কোনও যুক্তিতেই সংশয়বাদের অনুকূল ছিল না। অখৃষ্টীয় ছিলনা তাঁর পারিবারিক আবহাওয়াও। ড্রামণ্ডের স্কুলেও তিনি কোনও নাস্তিকতা শেখেননি। পিতার জীবৎকালে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময়ে বাইবেল পাঠ করতেন এবং বাইবেল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাল্যকালে একটি প্রার্থনা সংগীত পর্যন্ত রচনা করেছিলেন বাইবেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।[4.21] কিন্তু শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি কোনও-রকম প্রথাগত খৃষ্টধর্ম-অনুরাগ দেখাননি। কারণ, তাহলে যুক্তিবাদ শেখানো যায় না; উল্টে ছাত্ররা খৃষ্টধর্মের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে। সুতরাং তিনি ছাত্রদের টমাসপেনের 'এজ অফ রীজনের' কথা বলতেন। বলতেন বেন্থাম ও হিউমের চিন্তাধারার কথা। এসব ব্যাপার অবশ্যই খৃষ্টান মিশনারীদের অসন্তুষ্ট করতো। সোজা ব্যাটে খেলাই তাদের পছন্দসই ছিল। ছাত্রদের 'এজ অফ রীজন' পড়ানোর জন্য বা জোব্বা পরা পাদ্রী সেজে পাদ্রীদের ভাবভঙ্গী নকল করে ছাত্রদের কৌতুকাভিনয় করার জন্য তারা ডিরোজিওকেই দোষারোপ করতো। ডিরোজিও যে উল্টো ব্যাটে খেলেই ভারত জুড়ে যিহোভার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ছিলেন একথা শেষ পর্যন্ত অনুভব করতে পেরেছিলেন শিক্ষিত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ।

হিন্দুকলেজের কিশোরদের মস্তিষ্ক চর্বণ করতে গিয়ে ডিরোজিও স্কুলের শিক্ষণ সময়ের তোয়াক্কা রাখতেন না। প্রধান শিক্ষক ডি আনসেলমের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর বিবাদ ঘটতো। প্রতিমাসে ছাত্রদের পড়ানোর অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষককে রিপোর্ট দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ডিরোজিওর রিপোর্ট পড়ে ক্ষুব্ধ হতেন প্রধান শিক্ষক। একবার তিনি রিপোর্ট পড়ে ডেভিড হেয়ারের সম্মুখেই ডিরোজিওকে প্রহার করতে উদ্যত হন। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়ায়। প্রধান শিক্ষক কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন, ডিরোজিও পড়া তৈরীর অছিলায় আগেভাগে স্কুল পালান।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পড়ানো ও টৌনিদা হওয়া ছাড়া আর কী করতেন ডিরোজিও? অবশ্যই কবিতা লিখতেন। আর সম্পাদনা করেছিলেন এক মাসিক পত্রিকা—ক্যালিডোস্কোপ। ক্যালিডোস্কোপের মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন আর এক ইউরেশীয়—পি. এস. ডিরোজারিও। পত্রিকাটি একটি ইউরেশীয় উদ্যোগ।

কী আছে ক্যালিডোস্কোপে? ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়[4.22] ক্যালিডোস্কোপের সব কটি সংখ্যাই উদ্ধার করে মুদ্রিত করেছেন নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধাবলী। নীচে ক্যালিডোস্কোপের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কবিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হলো ঃ

ক্যালিডোস্কোপ ঃ নির্বাচিত রচনা

প্রথম সংখ্যা ঃ আগস্ট—1829

1. সম্পাদকীয় সম্ভাষণ ঃ ভূমিকাস্বরূপ, ব্যাখ্যামূলক, প্রতিবাদপূর্ণ ও উৎসর্গস্বরূপ ঃ এটি স্বয়ং ডিরোজিওর রচনা বলে সন্দেহ করা যায় সহজেই। এতে আছে পাঁচ স্তবক কবিতা। তৃতীয় স্তবকে বলা হয়েছে পত্রিকার পরিচালনায় দুজন মানুষ আছেন।

2. একটি সনেট--ডিরোজিওর বিখ্যাত কবিতা—টু মাই পিউপিলস্। ঠিকানা H, C, তারিখ জুলাই 1829.

3. মফঃস্বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ানরা; মফঃস্বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের প্রতি প্রযোজ্য আইন।

লেখাটি একটি প্রবন্ধ। লেখকের নাম নেই। তবে তিনি যে একজন ইউরেশীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতার বাইরে তৎকালীন ইউরেশীয়দের হিন্দু বা মুসলিম আইনের অধীনস্থ হয়ে বাস করতে হতো। লেখক সেই বিড়ম্বনার কথা আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। লক্ষণীয় যে ইউরেশীয়রা দেশীয়দের থেকে নিজেদের আলাদা করে তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বলে গণ্য করছেন।

দ্বিতীয় সংখ্যা—সেপ্টেম্বর 1829

1. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ—প্রথম পর্ব। লেখক E. E. 1813 খৃষ্টাব্দের পর 1833 খৃষ্টাব্দে বৃটীশ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারত শাসনের জন্য পুনর্বার সনদ দেয়। সেই সনদ দেওয়ার প্রাক্কালে পর পর দুটি সংখ্যায় লেখক তাঁর ইউরেশীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সনদ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনের সফলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যান্য জনকল্যাণকর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতবাসীরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চায়। কারণ কোম্পানী দেশীয় রাজা ও মুসলমান শাসকদের বর্বরতা থেকে ভারতবাসীকে রক্ষা করেছে। সমসাময়িক সমাজ দুর্নীতিযুক্ত না হলেও দুর্নীতি আগের যুগের তুলনায় অনেক কম।

2. ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ভারতে উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গে। লেখক—S. J.

এই প্রবন্ধ সুরু হয়েছে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে ঃ ভারতে বৃটীশ উপনিবেশ স্থাপন কি বৃটীশ শাসনকে বিপদগ্রস্ত করবে ? পরের প্রশ্ন, বৃটীশ উপনিবেশায়ন কি সাধারণভাবে ভারতবাসীদের উপকার করবে ?

তারপরে প্রবন্ধকার বলেছেন ঃ "সবচেয়ে পল্লবগ্রাহী দর্শকও অনুভব করবেন যে ভারতে প্রভুত্ব কায়েম রয়েছে সামরিক শক্তির দ্বারা। এই শক্তি সরিয়ে নিলেই ভারতবাসীদের অহমিকাপূর্ণ মতামত বৃটীশ শক্তিকে সমর্থনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সম্প্রতি আমরা সংবাদপত্র মারফৎ অবগত হয়েছি যে লখনৌতে মহরমের সময়ে কোম্পানীর শাসনের অবসানের জন্য সর্বসাধারণের দ্বারা প্রার্থনা করা হয়। এখন একথা পরিষ্কার যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয়দের যদি এদেশে বসবাস করতে দেওয়া হয় তাহলে এ ধরনের বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে একটা ভারসাম্য রচনা করা সম্ভব।"

একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে ওই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকৃত ভারতে সাম্রাজ্য হারানো মুসলিম প্রজারা বৃটীশ শাসনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরিলবী বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। লখনৌ-এর মুসলমানদের আচরণ সেই জেহাদী মানসিকতারই প্রতিফলন। সেই যুযুধান মানসিকতা দেখে প্রবন্ধকার অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের ভারতে বসবাসের মাধ্যমে জনবসতির রূপরেখা (Population pattern) পাল্টে সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদ অনুভব করেছেন। কারণ, রাজনৈতিকভাবে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদই

ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা দিতে পারে। ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা যে বৃটীশ শাসনের মধ্যেই নিহিত ছিল সেকথা আজ স্বাধীন ভারতে খুবই স্পষ্ট। পরাধীন ভারতে যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা দেশীয়দের ওপর হম্বিতম্বি করতো সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা আজ লুপ্ত প্রাণীর পর্যায়ে। পঞ্চাশের দশকেও এদের ব্যাপকভাবে দেখা যেত কলকাতার পথে ঘাটে। রেল কোম্পানীগুলিতে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে ও অন্যান্য সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে চাকরীরত ছিল বহুসংখ্যক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তারা আজ প্রায় অদৃশ্য। অনেকেই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড বা কানাডাতে। তাদের ম্যাকলাস্কীগঞ্জের মত উপনিবেশ এখন চলে গেছে অন্যদের দখলে।

এ হচ্ছে প্রবন্ধকারের ভাবনাচিন্তার একদিক। পরে আমরা দেখবো ডিরোজিও শিষ্যদের 'পার্থেনন' পত্রিকাতে একই ভাবনাচিন্তা উচ্চারিত হয়েছে গুরুর মহিমাতে। অন্যদিকে প্রবন্ধকার অনুভব করেছেন অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের এদেশে বসবাস সুখকর হবে না। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাদ লাগতে পারে। কারণ, সামাজিকভাবে ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয়রা যতোটা অচ্ছুৎ, ইউরেশীয়রা ঠিক ততোটাই অচ্ছুৎ। সুতরাং সঙ্গত কারণেই ইউরেশীয় প্রবন্ধকারের এই দ্বৈত মানসিকতা। প্রবন্ধের শেষে লেখক আকাঙ্খা করেছেন, বৃটীশ শাসন বজায় রেখে নানাক্ষেত্রে দেশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সামাজিক ও প্রশাসনিক পার্থক্য অবসানের জন্য। এই মানসিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল ছিল। তাঁরাও বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ বৃটীশ শাসন তাঁদের তুর্কী বর্বরতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আবার তাঁরাই নানারকম প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা আকাঙ্খা করতেন বৃটীশ শাসকদের কাছ থেকে।

দ্বিতীয় সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা। লেখক—শ্রীহট্টের জনৈক F।

লেখাটি একটি সংখ্যাতেই শেষ হয়নি। পরপর ছটি পর্বে লেখাটি পরিব্যাপ্ত। সুতরাং গোটা 'ক্যালিডোস্কোপের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুচ্ছ।

এই প্রবন্ধের লেখক পরিতৃপ্ত যে ঔপনিবেশিক সরকার দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করছেন এবং নানারকম সংস্কারমূলক কাজকর্ম করছেন যাতে **দেশীয়দের সুপ্রাচীন আচরণ, নীতি ও রাজনীতির বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে।** এক কথায় ভারতবাসীর মন থেকে ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা চিরতরে মুছে দিতে চান এই প্রবন্ধকার। কিন্তু তারপর ?

তারপর ইসলাম, হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মকে যদি কোনও কর্তৃপক্ষ মদত না দেন, এবং তিনটি সম্প্রদায় যদি একে অপরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়, তবে একটি সময় আসবে যখন সবচেয়ে ভাল ধর্মটাই বেঁচে থাকবে। বাকী দুটো মুছে যাবে। কারণ সবচেয়ে ভাল ধর্মের শক্তি বেশী।

এই সবচেয়ে ভাল ধর্মটা যে খৃষ্টধর্ম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ "ঈশ্বরের অভিলাষ অনুযায়ী দেশটা এখন আমাদের কব্জায়। যদিও দেশটায় আমাদের কোনও অধিকার নেই। তবুও নানা অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় দেশটা আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।"

এই প্রবন্ধের চতুর্থ পর্বে ভারতীয়দের শিথিল চরিত্র ও কবিগানের মধ্যে খিস্তি খেউড়ের জন্য পৌত্তলিকতাকেই দায়ী করা হয়েছে। কারণ **হিন্দুদের কাল্পনিক দেবদেবীরা নাকি খিস্তি খেউড় ও অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গীতেই তুষ্ট হন**। সুতরাং প্রথমতঃ ভারতীয়দের সামগ্রিকভাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হবে, তারপর তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি প্রদান করে সভ্যভব্য করতে হবে।

এছাড়া প্রবন্ধের বিভিন্ন পর্বে দেশীয়দের সাধারণভাবে তঞ্চক বলা হয়েছে। যেহেতু ভারতের অধিবাসীরা তঞ্চক সেহেতু ভারতীয়-নির্ভর তৎকালীন প্রচলিত আইনের পরিবর্তে একটি অভিন্ন আইনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিচারকদের দ্বারা বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হলে তঞ্চক পণ্ডিত ও মৌলভীদের হাত থেকে বিচার ব্যবস্থা রেহাই পাবে।

তৃতীয় সংখ্যা : অক্টোবর 1829

একমাত্র প্রবন্ধ : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ—দ্বিতীয় অংশ।

চতুর্থ সংখ্যা : নভেম্বর— 1829

একমাত্র প্রবন্ধ : ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা—দ্বিতীয় পর্ব

পঞ্চম সংখ্যা : ডিসেম্বর—1829

এই সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ : হিন্দুদের উৎসব সম্বন্ধে মন্তব্য। লেখক M. T. এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে দুর্গাপূজার সময়ে কবিগানের মধ্যে খিস্তি খেউড় করা হয়। **কারণ, দেবী দুর্গা নাকি একমাত্র খিস্তি খেউড়েই পরিতৃপ্ত হন**। প্রবন্ধে প্রথমে পৌত্তলিকতাকে খিস্তি করে রচনা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে। পঞ্চম সংখ্যার অন্য প্রবন্ধ : ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য। লেখক—অজ্ঞাতনামা।

ষষ্ঠ সংখ্যা : জানুয়ারী 1830

এই সংখ্যার প্রবন্ধ : ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা—তৃতীয় পর্ব

সপ্তম সংখ্যা ঃ ফেব্রুয়ারী 1830

এই সংখ্যার প্রবন্ধ ঃ হিন্দুস্থানের চাষবাস। লেখক বঙ্গদেশের চাষবাসের উন্নতি প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন এই প্রবন্ধে। লেখক—অজ্ঞাতনামা।

অষ্টম সংখ্যা ঃ মার্চ 1830

এই সংখ্যার ঃ চারটি প্রবন্ধের প্রথম হলো ঃ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা—চতুর্থ পর্ব। দ্বিতীয়টি হলো ঃ ভারতের বৃটীশ সরকার সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহী মন্তব্য। লেখক অজ্ঞাতনামা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতের শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। তৃতীয় প্রবন্ধ ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের উপনিবেশ স্থাপন। লেখক—J. S. লেখকের বক্তব্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়ানদের বসতির ফলে ভারতে ধলা, ধূসর আর কালা তিন শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হবে। পরে তিনটি জাতির মধ্যে সংমিশ্রণের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে একটি অভিন্ন জাতিসত্তার। এই প্রবন্ধেও লক্ষ্য করা যায় প্রবন্ধকার ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের পাই পয়সাও মূল্য দিতে রাজী নন।

চতুর্থ প্রবন্ধ ঃ বেঙ্গল হরকরু এবং ক্রনিকলের প্রতি উপদেশ। লেখক অজ্ঞাতনামা, খুব সম্ভব সম্পাদকই ঃ উক্ত পত্রিকাটি সম্ভবতঃ ক্যালিডোস্কোপের কোনও বক্তব্যের সমালোচনা করে। তারই প্রতিবাদরূপে এই প্রবন্ধের উৎপত্তি। অভদ্র ও উদ্ধত ভাষায় লেখা প্রবন্ধটির শেষ বাক্যটি হলোঃ "কিন্তু চাবুকের আঘাত যদি কোলাহলকারী গর্দভের চিৎকার বন্ধ করতে না পারে তবে আমরা মুগুরের আঘাতে গাধাকে স্তব্ধ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প।"

নবম সংখ্যা ঃ এপ্রিল 1830

এই সংখ্যার একমাত্র প্রবন্ধ ঃ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা—পঞ্চম পর্ব।

দশম সংখ্যা ঃ মে 1830

এই সংখ্যার একমাত্র প্রবন্ধ ঃ 1827 খৃষ্টাব্দে সুন্দরবন ভ্রমণ—লেখক—একজন ভ্রমণকারী। উন্নাসিক ভ্রমণকারী ভ্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছ গালি-গালাজ করেছেন ভারতীয়দের।

একাদশ সংখ্যা ঃ জুন 1830

এই সংখ্যার একমাত্র প্রবন্ধ ঃ ভারতের বর্তমান অবস্থার রূপরেখা—ষষ্ঠ পর্ব।

দ্বাদশ সংখ্যা জুলাই 1830

এই সংখ্যার একমাত্র প্রবন্ধ ঃ বাংলা প্রদেশের হিন্দু মুসলমানদের স্বভাব চরিত্রের রূপরেখা, লেখক—অলটার্স উইলিয়ার্স।

এতে যথেষ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে ভারতীয় নারীদের সন্তান প্রসব ব্যবস্থা।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে এক বছরের ক্যালিডোস্কোপ পত্রিকার বিবরণ। এই পত্রিকার সমস্ত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ইউরেশীয় মানসিকতার লেখকেরা ভারতে চিরতরে বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী (যদিও ওয়ারেন হেস্টিংসের মত সাম্রাজ্যবাদীও বিশ্বাস করতেন ভারতে একদিন বৃটীশ শাসনের অবসান ঘটবে)। সেই সঙ্গে সমস্ত দেশীয় ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও হিন্দুধর্ম (এবং ইসলামও) মুছে দিয়ে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সংস্কৃতির মিশ্রণে এক নতুন জাতি গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর। সে জাতি ধর্মগতভাবে অবশ্যই খৃষ্টান হবে। কোনও রকম বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার স্থান ক্যালিডোস্কোপে দেখা পাওয়া যায়নি। খৃষ্টধর্মই অবধারিত সত্য। এ নিয়ে কোনও বাদানুবাদের অবকাশ নেই। আর আছে হিন্দুধর্মের প্রতি দারুণ ঘৃণা—যা প্রতিটি সম্প্রসারণবাদী একেশ্বরবাদের সহজাত। বাঙ্গালীদের নৈতিক চরিত্রের অবনতির জন্য হিন্দু দেবদেবীকেই দায়ী করেছেন দুজন লেখক। কারণ, দেবদেবীরা কেবল অশ্লীল কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গিতেই তুষ্ট হন!

ক্যালিডোস্কোপের দৃষ্টিতে ভারতীয়রা সাধারণভাবে তঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। একশ্রেণীর ভারতীয়রা বৃটীশ শাসনের বিরোধী হলেও একশ্রেণীর ভারতীয়রা বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী। যারা বৃটীশ বিরোধী তাদের প্রশমিত করার উপায় অধিক সংখ্যক খৃষ্টান ইউরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপন।

প্রশ্ন উঠতে পারে ক্যালিডোস্কোপের দৃষ্টি কী ডিরোজিওর দৃষ্টি? যেখানে কেবলমাত্র একটি কবিতাকেই ডিরোজিওর রচনা বলে সরাসরি চিহ্নিত করা যাচ্ছে?

গৌতম চট্টোপাধ্যায় যখন একটি প্রবন্ধের বক্তব্যের জন্য সম্পাদক ডিরোজিওকে দায়ী করেছেন তখন পল্লব সেনগুপ্ত উত্তরে বলেছেন, ডিরোজিও উদার গণতান্ত্রিক মনভাবাপন্ন ছিলেন। সেজন্য বিরোধী বক্তব্যকেও পত্রিকায় ঠাঁই দেবার মত মানসিকতা তাঁর ছিল।[4.23] এই ধরনের যুক্তি আদৌ সন্তোষজনক নয়। কারণ প্রত্যেক পত্রিকা সম্পাদকের ও পত্রিকা মালিকের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁরা পত্রিকার লেখা নির্বাচিত করেন। অন্যমতের লেখা তাঁরা কখনই ছাপেন না। এমনকি জনমত প্রতিফলনের জন্য যে চিঠিপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা থাকে পত্রিকাগুলিতে, তাতেও তাঁরা নিজেদের মত বিরুদ্ধ উগ্র ধরনের চিঠি প্রকাশ করেন না। তবে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্য 'ঢোঁড়াসাপ' জাতীয় দু একটি চিঠি ছাপেন মাত্র। এমনকি তাঁরা

নিজেদের অপছন্দের বিজ্ঞাপনও ছাপেন না। সম্প্রতি দুই সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদিকা সংবাদপত্রে অভিযোগ করেছেন তাঁদের নিরীহ 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন ছাপতে অস্বীকার করেছেন কলকাতার নামী পত্রিকা। কারণ, তাঁরা বেকার পাত্র চেয়েছিলেন।

ডিরোজিও একজন পত্রিকা সম্পাদক। তিনি নিজের মতবিরুদ্ধ প্রবন্ধ ছাপার জন্য পত্রিকা চালাবেন, এ ধরনের প্রত্যাশা নিতান্তই হাস্যকর। তাছাড়া ছাত্রসমাজের বাইরে ডিরোজিও উদার ছিলেন এটা আর একটি বেমক্কা মিথ্যা। ডিরোজিওর যথেষ্ট অহমিকা ছিল তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে। একথা লিখেছেন তাঁরই ছাত্র রাধানাথ শিকদার। আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনীকার জর্জ স্মিথ জানিয়েছেন ডিরোজিও ছিলেন স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন অতিশয় দাম্ভিক ইউরেশীয়। 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' পত্রিকাতে ক্যাপ্টেন ম্যাকনাটন নামক জনৈক লেখকের নামে ব্যক্তিগত কুৎসা (ক্যাপ্টেন দোকান থেকে জিনিস কিনে ধার শোধ করেন না) প্রচার করার জন্য ক্যাপ্টেন সরাসরি এসে ডিরোজিওকে বেত্রাঘাত করেন। অন্যের ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার নিশ্চয় উদার মানসিকতার পরিচয় নয়। এছাড়া অন্যের মতামত সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট অসহিষ্ণু ছিলেন তার প্রমাণ তো ক্যালিডোস্কোপের পাতাতেই রয়েছে। হরকরু ও ক্রনিকলের পরিচালকদের হুমকী দিয়ে লেখা প্রবন্ধটি তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ হেন মানসিকতার লোক, তিনি যা পছন্দ করেন না তা ছাপবেন, এটা মনে করা চরম যুক্তিহীনতার পরিচয়। মনে রাখতে হবে কোনও রকম সমঝোতার মানসিকতা ডিরোজিওর ছিল না। নিজে যা ন্যায় মনে করতেন সেটাই করতেন। চাকরীর ঝুঁকি নিয়েই হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের হিন্দু ছাত্রদের মুখে হিন্দুধর্ম নিপাতের শ্লোগান তুলিয়েছিলেন তিনি—যা আজকালকার অনুগ্রহ-লোভী সেকুলাররা চিন্তাও করতে পারবেন না। সুতরাং আমরা ক্যালিডোস্কোপে চোখ রেখে মাননীয় সম্পাদকের মানসিকতা সঠিকভাবেই দর্শন করতে পারছি।

এছাড়া ক্যালিডোস্কোপের অনেক প্রবন্ধই ডিরোজিওর রচনা বলে সন্দেহ করা যায়। কারণ, নানারকম ছদ্মনামের আড়ালে ডিরোজিও লেখালেখি করতেন। যেমন জুভেনিস, ইস্ট ইণ্ডিয়ান, হেনরী ইত্যাদি। সুতরাং সব মিলিয়ে ডিরোজিও যে ক্যালিডোস্কোপ-সুলভ ইউরেশীয় মানসিকতা থেকে আলাদা ছিলেন একথা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। তিনি ইউরেশীয় রাজনীতি করতেন, নিজস্ব পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়ান। তিনি তো ডেভিড হেয়ারের মত নিজস্ব সমাজ ও ধর্ম ছেড়ে হিন্দুদের উপকার করার জন্য আত্ম বিসর্জন দিয়ে 'আধা হিন্দু' ও খৃষ্টদ্রোহী বদনাম কেনেননি। হেয়ারের না

জুটলেও ডিরোজিওর প্রথাগত খৃষ্টীয় কবরখানা বরাদ্দ হয়েছিল।

সুতরাং ইয়ংবেঙ্গল নামধেয় হিন্দুসমাজের প্রতিভাবান (ডিরোজিওর আগমনের আগেই উইলসন দক্ষিণারঞ্জন ও রামগোপালকে প্রতিভাবান ছাত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন) কিশোরদের দাদাগিরির ইউরেশীয় উদ্দেশ্য ছিল তাদের সমাজ-সংস্কৃতি ভুলিয়ে খৃষ্টান করা। কারণ প্রতিটি ধর্মান্তরিত হিন্দুই বৃটীশ সাম্রাজ্য তথা ইউরেশীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। নতুবা বৃটীশ সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এককালে অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করা ইউরেশীয়রা ধূলায় মিলিয়ে যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমানদের চাপে। ডিরোজিওর ভাবনা চিন্তার প্রায় একশো কুড়ি বছর পর প্রকৃতই যা ঘটেছে।

সুতরাং যারা ভাবেন ডিরোজিও একজন বিশুদ্ধ সংস্কারক, তরুণ হিন্দু বাঙ্গালীদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে একদল আধুনিকমনা দেশপ্রেমিক ভারতীয় সৃষ্টিই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। ডিরোজিও মাদুরাই মিশনের ডি নোবিলির একটি উন্নততর সংস্করণ মাত্র। মিশনারীদের কপালগুণে এবং আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকজন প্রতিভাবান বাঙ্গালী কিশোর তাঁর খপ্পরে পড়েছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর ফলেতেই ক্ষয়ক্ষতিটা কম হয়েছে। নতুবা আরও বহু বহু কেষ্টাবান্দার সৃষ্টি হতো বঙ্গসমাজে। দুরাত্মার ছল তো সহজে বোঝা যায় না। তৎকালীন হিন্দুসমাজের যাবতীয় অধঃপতনের জন্য হিন্দু দেবদেবীকে দায়ী করে হিন্দুধর্ম নিপাতের স্লোগান তুলেছিলেন ডিরোজিও। ফলে যথেষ্ট ঘোলা হয়েছিল বঙ্গদেশের ধর্ম সামাজিক পুষ্করিণী। সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসেন স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ। বেশ কিছু মাছ তিনি ধরেনও।

হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কালীন কবিতা লিখতেন ডিরোজিও। কবিতা লেখার সুরু অবশ্য ভাগলপুর বাস কালীন। সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে কী ধরনের মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

সহমরণ প্রথা ডিরোজিওর সমকালে বঙ্গসমাজের একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন ছিল। ডিরোজিও সহমরণ প্রথাকেই কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেন। অনেকেরই ধারণা সহমরণ এক ধরনের হত্যাকাণ্ড। সদ্যবিধবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে তাদের সহমৃতা হতে বাধ্য করা হতো। এই ধরনের অনিচ্ছুক হিন্দু বিধবাকে যদি একজন খৃষ্টান বা মুসলমান উদ্ধার করে এবং তাঁর সঙ্গে প্রেম পরিণয় ঘটে তাহলে দারুণ একটা রোমাণ্টিক ব্যাপার দাঁড়ায়। আজকাল বাংলাতেও এই ধরনের নানা গল্প উপন্যাস লেখা চলছে। যদিও ইতিহাস বলে, বাস্তবে এ

ধরনের অনিচ্ছুক বিধবার সংখ্যা নগন্য। 'সতী' সম্পর্কে গবেষক স্বপন বসু জানিয়েছেন দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বিধবাই স্বেচ্ছায় 'সতী' হতো। স্বপন বসু আরও জানিয়েছেন, "রামমোহন নিজে কালীঘাটে অনুষ্ঠিত এক সতীদাহে শিববাজারের এক হিন্দু চিকিৎসক নীলুর 23 ও 20 বছর বয়সী দুই স্ত্রীকে ফেরাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। দুজন মহিলাই অবিচলিতভাবে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কনিষ্ঠ বউটি অগ্নিপ্রবেশ করার আগে রামমোহনকে ও সেখানে সমবেত অন্যান্যদের সহমৃতা হওয়া থেকে মেয়েদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ত্যাগ না করলে অভিশাপের ভয় দেখান।"

যাইহোক হিন্দুসমাজের ছিদ্র এই অমানবিক প্রথাটিকে ডিরোজিও স্বাভাবিক হিন্দুবিদ্বেষের কাজে লাগান। সহমরণ নিয়ে ডিরোজিও আখ্যানকাব্য লিখেছেন, 'দি ফকীর অফ জঙ্ঘীরা'। সহমৃতা হতে যাওয়া বিধবা নলিনীর উদ্ধারকর্তা এখানে একজন মুসলমান যুবক। গোটা কাব্যটিতে ডিরোজিওর স্বকপোলকল্পিত অনেক বর্ণনা আছে যা অবাস্তব। সকলেই জানেন শ্মশানে যে সব পুরোহিত শবদাহে মন্ত্রপাঠ করেন পুরোহিত হিসাবে তাদের কোন কৌলিন্য নেই। 'মড়িপোড়া বামুন' হিসাবেই তাঁরা অভিহিত হন। তাঁরা সামান্য অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন চালকলা বাঁধা পুরোহিত মাত্র। শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ থেকে বহুদূরে তাঁদের অবস্থান। ডিরোজিও সহমরণের সময় বিশাল বেদমন্ত্র পাঠ বর্ণনা করেছেন মড়িপোড়া বামুনের মুখে। অথচ সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাদীক্ষার প্রচুর আকাল চলছিল। সংস্কৃত জানা শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আর বেদ বেদান্ত ? মিশনারী ওয়ার্ডের মতে ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই একমাত্র বেদান্তের চর্চা করতেন।[4.24] কলকাতার তেলেঙ্গী ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেই জানতেন না। সুতরাং সতীদাহের সময় মড়িপোড়া বামুনের মুখে ঋগ্বেদ পাঠ নিতান্তই আষাঢ়ে গল্প। এই আষাঢ়ে গল্পই স্থান পেয়েছে ফকীর অফ জঙ্ঘীরাতে। আসলে প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হোরেস হেম্যান উইলসনের দৌলতে ডিরোজিওর বেদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মেছিল। ওই সময়ে উইলসন ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছিলেন। ডিরোজিও সেই নবলব্ধ জ্ঞানই উগরে দেন ফকীর অফ জঙ্ঘীরাতে, ঋগ্বেদ ভিত্তিক একটি বিশাল সূর্যস্তোত্রের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে ডিরোজিও আখ্যান কাব্যটি উইলসনকেই উৎসর্গ করেন। সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে এ কাব্যের ব্যাপারে তিনি টমাস ক্যাম্পবেল বা টমাস মুরের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরিবেশ বা অনুসঙ্গ ব্যবহারে টমাস মুর, বিশেষ করে মুরের **Lalla Rookh** কাব্যের অগ্নি উপাসকদের প্রসঙ্গ তাঁকে সহায়তা করেছে।[4.25] পল্লব সেনগুপ্ত কি করে যেন এরই মধ্যে পেয়েছেন ডিরোজিওর "সামাজিক

দৃষ্টির একটি অভিনিবিষ্ট এবং পূর্ণায়ত পরিচয়।"[৫·২৬] ডিরোজিও নাকি সহমরণের "পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ করেছেন।" ঘটনাস্থলে কোনও বেদজ্ঞ পুরোহিতের কাছে ওইসব স্তোত্রের ব্যাখ্যা তিনি নাকি জেনে নিয়েছিলেন! কিন্তু আগেই আমরা জেনেছি বঙ্গদেশে সহমরণের সময় বেদজ্ঞ পুরোহিতের উপস্থিতি গোঁফওলা মাসীর অস্তিত্বের মতই অসম্ভব ব্যাপার! ফকীর অফ জঙ্ঘীরা সেকালের এক সমালোচকের মতে বায়রণীয় রোমান্সের অনুকরণ। তবে আখ্যান কাব্যের কোনও কোনও অংশে যে নবীন কবির স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, সেকথা অনস্বীকার্য। ফকীর অফ জঙ্ঘীরার শেষে 'হিন্দু বিধবা' নাম দিয়ে ডিরোজিও একটি ছোট নিবন্ধও রচনা করেন হিন্দু বিধবাদের দুঃখ কষ্ট নিয়েঃ হিন্দু বিধবাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে দেওয়া হয় না, তাদের ঘরের মেঝেতে শুতে হয়। অসম্মান ভোগ করতে হয় পরিবারের কনিষ্ঠদের কাছ থেকে, ইত্যাদি।

এসব অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে স্মরণে রাখতে হবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ডিরোজিওর সমকালে বিধবা বিবাহের চল ছিলনা। কিন্তু খৃষ্টান সমাজে অল্পবয়সী বিধবাদের বিবাহ বাইবেল সম্মত। আর মুসলিম সমাজে তো যে কোনও বয়সী বিধবার বিবাহ 'সুন্না' বা নবী আচরিত পবিত্র কর্ম। কিন্তু একথা প্রশ্নাতীত যে পৃথিবীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিধবা বিবাহ সামগ্রিকভাবে প্রশংসিত নয়। বিদ্যাসাগর বহুদিন আগে বিধবা বিবাহের প্রচলন করলেও বিংশ শতাব্দীর শেষেও দেখা যায় সাধারণতঃ সন্তানহীনা বিধবারাই পুনর্বিবাহ করেন। পুত্রবতী বিধবাদের বিবাহ বিরল ঘটনা। বাইবেলে প্রৌঢ় বিধবার বিবাহের কথা নেই। পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের বিধবাদের পুনর্বিবাহ সমালোচিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডীর বিধবা, দেশের 'ফাণ্ট লেডী' জ্যাকেলিন গ্রীক ধনপতিকে বিবাহ করায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঢেউ উঠেছিল। বিধবা বিবাহ সুন্না হলেও আশরফ মুসলিম সমাজে একদা বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ছিল। এছাড়া সেই সমাজের তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলারা পুনর্বিবাহ করেন না। বেগম রোকেয়া এবং তাঁর দিদি বেগম করিমুন্নেষা খানম যথেষ্ট অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই পুনর্বিবাহ করেননি। প্রাতঃস্মরণীয়া বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল মুসলিম মহিলার স্বামীর স্মৃতিরক্ষার শাশ্বত উদাহরণ।

এই পরিস্থিতিতে বিধবা বিবাহহীন সমাজে হিন্দুবিধবাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য না দেওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। বিশেষতঃ উচ্চ প্রোটিনযুক্ত

খাদ্য যখন কামোত্তেজক বলে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত। মেঝেতে শোওয়া ? গ্রীষ্ম প্রধান দরিদ্র বঙ্গদেশে বহুলোকেই মেঝেতে শয়ন করেন। এর মধ্যে অবজ্ঞার কী আছে ? আর বিধবারা পরিবারের অল্প বয়স্ক সদস্যদের দ্বারা অপমানিত হতেন, এ ধরনের অপপ্রচার খিস্তি খেউড়ের দ্বারা দেবী দুর্গার তুষ্ট হওয়ার মতই ভিত্তিহীন। সুতরাং ডিরোজিওর হিন্দুবিধবাদের অবস্থার পর্যালোচনা স্থান কাল পাত্রী বিচারে নেহাৎ অপপ্রচার মাত্র। ইউরেশীয় বিধবাদের মত হিন্দু বিধবারা মদ্যপান করেছেন আর গোমাংস ভক্ষণ করছেন—এ ধরনের দৃশ্য ক্যালিডোস্কোপেই দেখা যেতে পারে, বাস্তবে নয়।

ডিরোজিওর অন্য দুটি বহু আলোচিত কবিতা হলো, **To India—My native land** এবং **The Harp of India.** এই দুটি কবিতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্বদেশপ্রেম আবিষ্কার করেছেন রাজনারায়ণ বসু থেকে বহু আলোচক। ভারত ডিরোজিওর স্বদেশ তাতে সন্দেহ নেই—যেহেতু পর্তুগাল বা ইংলণ্ড ডিরোজিওদের ঠাঁই দিতে নারাজ। এখন অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ ডিরোজিওদের ঠাঁই দিয়েছে, সেজন্য তারা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু স্বদেশের কোন্ ছবি কবিতা দুটিতে পাওয়া যায় ?

স্বদেশ চেতনা ভৌগোলিক রূপ নিতে পারে। যেমন পুরাণের দেশ বর্ণনা ঃ

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণং চ যৎ।
বর্ষং তদ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা॥ বায়ুপুরাণ

দক্ষিণাপরতো হ্যস্য পূর্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্মুকস্য যথা গুণঃ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ

স্বদেশ চেতনা রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্খা প্রকাশ পেতে পারে কবিতার মধ্যে। তা ডিরোজিওর কবিতায় পাই না। দেশের অতীত গৌরব ফিরিয়া আনার কথা আছে বটে। কিন্তু ভারতের অতীত গৌরবের কোন্ রূপরেখা ফুটে উঠেছে কবিতার মধ্যে ? 'জ্যোতির মণ্ডলী ভূষিত তোমার ললাটে' বা 'দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে,' নিতান্তই কথার কথা। শ্রীরামচন্দ্র মুখনিঃসৃত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"র তুলনায় নিতান্তই জোলো।

স্বদেশ চেতনা দেশের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারে। পরিচিত নদী, পর্বত পশুপক্ষী, ফল-ফুল, বৃক্ষ-শস্যক্ষেত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এমন কি নগর শহর। যাতে ছত্রগুলি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে দেশের একটি ভাবমূর্তির উদয় হয়। যেমন ঃ

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

অথবা, গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু॥

সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এরকম কোনও কিছু কি পাওয়া যাচ্ছে ডিরোজিওর কবিতাতে? হরিৎক্ষেত্র কি আকাশতলে মিশেছে, না বাতাস ঢেউ খেলে যাচ্ছে ধানের ক্ষেতের ওপর?

না, পাওয়া যায় না। কারণ ইউরেশীয় মানসিকতা এসব অনুভব করতে পারে না। ইউরেশীয়র পা দেশের মাটিতে থাকলেও মাথাটা অদেখা বিলেতে বাঁধা। ডিরোজিওর মাথা যে সত্যি সত্যিই বিলাতে বাঁধা ছিল সেটা তাঁর জীবনীকার এডওয়ার্ডস বলেছেনও। Harp কে বীণা বানিয়েছেন পল্লব সেনগুপ্ত। কিন্তু অভিধানে বলে হার্প তারের বাদ্যযন্ত্র হলেও বীণা নয়—একটি ত্রিকোনাকার তারের বাদ্যযন্ত্র। ডিরোজিওর সমকালে কলকাতায় হার্প বাজানোর চল ছিল। মরুভূমির মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত মিনার ভারতের পরিচিত দৃশ্য নয়। ভারতে দেখা যায় ভাঙ্গা মন্দির, ভাঙ্গা বিহার, নিদেন পক্ষে ভাঙ্গা মসজিদ-প্রাসাদ-দুর্গ। ঈগল পাখীকে নিয়ে কোনও ভারতীয় কবি কবিতা লেখেন না। কারণ, ঈগল ভারতীয় পাখীই নয়। ভারতীয় কবি কবিতা লেখেন বলাকা-হংস-কেকা নিয়ে। তাহলে ডিরোজিও কবিতার মধ্যে ভারত নামক দেশটির সম্পর্কে গভীর অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে কি?

আসলে ডিরোজিওর দেশপ্রেমের কবিতা কিশোর কবির প্রেম না করে প্রেমের কবিতা লেখার মত। ডিরোজিওদের আকাঙ্খিত 'স্বদেশ' তখনও ক্যালিডোস্কোপের পাতাতেই আছে—আদৌ কেলাসিত হতে শুরু করেনি। সুতরাং কবিতার মধ্যে তার ছবি পাওয়া যাবে কী করে?

ডিরোজিওর কবিতা সম্পর্কে সি. পল ভার্গিস বলেছেন, ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার আদর্শ সংশ্লেষণ হয়নি। কারণ, ডিরোজিওর সাংস্কৃতিক নোঙ্গর ভারত বা ইংলণ্ড কোন দেশেই সুসংবদ্ধভাবে বাঁধা হয়নি।[4.2]

ডিরোজিওর অন্য একটি বহু আলোচিত কবিতা On the abolition of Satee. এটি উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কৃত সহমরণ-প্রথা বিলোপকারী আইন জারী করার পরে রচিত। এর একটি লাইন হলো, While priestly fiends have yelled a dismal song. এখানেও লক্ষ্য করার বিষয়, সহমরণের দায়টা শ্মশানের সেই গ্রাম্য পুরোহিতের ঘাড়েই চাপিয়েছেন ডিরোজিও; স্মৃতিশাস্ত্র

কারদের উনি চেনেন না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিতার মধ্য দিয়েও আমরা এক ইউরেশীয় মানসিকতার ডিরোজিওকে পাচ্ছি—যে ডিরোজিও সমভাবে হিন্দু বিদ্বেষীও বটে। কারণ, স্বাভাবিক মিশনারীদের মত ডিরোজিও হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মের সবচেয়ে প্রবল বিরুদ্ধশক্তি মনে করতেন।

অথচ ভারতকে সত্যিকারের ভালবাসতেন এরকম বিদেশী ডেভিড হেয়ার ছাড়াও অনেকে ছিলেন। তাদের কবিতায় অনেক সুন্দরভাবে ভারতের ভাবমূর্তি ধরা পড়েছে। যেমন ভারত প্রেমিক বিশপ রেজিনাল্ড হিবার। বাংলার নদী, ইলিশ মাছ, জেলে, গ্রামবাংলার তালবীথিঘেরা স্নিগ্ধশ্যামশোভা, গভীর রাতে শৃগালের ডাক সবই ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়।[4.28]

আবার ফিরে আসা যাক ডিরোজিওর শিক্ষকতার কথায়। গুরু ডিরোজিওর 'মুক্তচিন্তা' আর 'যুক্তিবাদে' বিভ্রান্ত ছাত্ররা তো "শূকর ও গোমাংসের মধ্য দিয়ে প্রগতির পথ খুঁজছিলেন এবং বিয়ারের গেলাসের মাধ্যমে উদারনীতির দিকে এগোচ্ছিলেন।" 1830 খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে গুরু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁরা 'পার্থেনন' নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করে বসলেন। এর মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তীব্র আক্রমণ রইলো। সেই সঙ্গে তীব্র মত পোষণ করা হলো ইউরোপীয়দের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপনের। অর্থাৎ 'ক্যালিডোস্কোপের' বক্তব্য এবং 'পার্থেননের' বক্তব্য মূলতঃ একই। এর থেকে ডিরোজিওর ষড়যন্ত্র স্পষ্টই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। ডিরোজিওর বন্ধু জন গ্রাণ্ট পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখলেন, "জন্মগতভাবে হিন্দু এবং শিক্ষাগতভাবে ইউরোপীয়রা যা করতে পারে তারই সুন্দর নিদর্শন"।[4.2]

রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' লেখে "আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে 'পার্থেনন' নামে ইংরেজী সমাচার পত্র বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ১ম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস—এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দুধর্ম ও গভর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য, এতদ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শনমাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব ২ ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও প্রাপকদিগের নিকট প্রেরিত হইতে দেন নাই; তথাপি পত্র-প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দুমণ্ডলীর তাবৎ লোক ভীত হইয়াছিল…।"[4.30]

ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং খুবই স্বাভাবিক বাধা দেওয়াটাও। কারণ, ব্যাপারটার মধ্যে বিজাতীয় প্ররোচনা রয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ছেলেদের স্কুলে পাঠানো। সেই স্কুলের বিধর্মী শিক্ষকের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ছাত্ররা হিন্দুধর্মের নিপাত করছে এবং দেশে বসতি স্থাপনের জন্য ইউরোপীয়দের ডেকে আনতে চাইছে। **অর্থাৎ ভারতের হিন্দুমুসলমান যাতে কোনওদিন আর ভারত সিংহাসন করায়ত্ত করতে না পারে তার জন্য ইউরোপীয়-দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনবসতির আদল পাল্টে দিতে চাইছে বঙ্গ সন্তানরা। এর চেয়ে দেশদ্রোহিতা আর কী হতে পারে?**

অথচ কলেজটা হিন্দুদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ যে যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া! এরকম দাঁতের গোড়া ভাঙ্গতে যে কোনওকালের কোনও প্রতিষ্ঠানই দেয় না সেটা বলাই বাহুল্য।

এমন সময় কলকাতায় এলেন স্কচ মিশনারী অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ। সময়টা 1830 খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ। ওঁর পিতা বলেছিলেন ভারতবর্ষের লোকেরা বড় পাপের মধ্যে বাস করে, তারা প্রতিমা পূজক। সুতরাং ডাফ প্রতিমাপূজকদের উদ্ধার করার জন্য চলে এলেন কলকাতায়। আহা! যেন সেসময়ে খোদ ইংলণ্ডের খৃষ্টানরা ধোয়া তুলসীপাতা ছিল! সাধারণ লোকদের কথা ছেড়ে দিলাম; রাজপুত্রদের কথাই বলি। রাজা জর্জের গুণধর পুত্র ডিউক অফ ক্লেয়ারেন্সের এক রক্ষিতা ছিল। ডিউক সেই রক্ষিতার পতিতাবৃত্তি দ্বারা লব্ধ আয়ের ভাগ বসাতেন। একই কাজ করতেন অন্য পুত্র এবং রাজ সেনাপতি ডিউক অফ ইয়র্ক।[4.31]

ডাফ কলকাতায় এসেই যোগাযোগ করলেন 'প্রিসেপ্ট অফ যেশাসের' লেখক হিসাবে মিশনারী জগতে কুখ্যাত রামমোহন রায়ের সঙ্গে। তিনি নিশ্চয় ফ্রান্সিস জেভিয়ারের চিঠি পড়েছিলেন। জেনেছিলেন হিন্দু সমাজের দুর্গরক্ষক ব্রাহ্মণদের কথা। সমস্ত হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণদের কথা শুনে চলে। সেই জন্যেই হিন্দুদের টপাটপ করে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান করা যাচ্ছে না। সময়টা ঊনবিংশ শতাব্দী। এখন আর খুন জখম করে ব্রাহ্মণদের টাইট দেওয়া যাবে না। অন্যপথ অবলম্বন করতে হবে, যাতে হিন্দু সমাজের উপরের স্তরের মানুষদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খৃষ্টান করা যায়। তাহলে গোটা দেশটাকে খৃষ্টান করতে আর বেগ পেতে হবে না। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ শিক্ষা বিস্তারটাকেই খৃষ্টানী করণের মাধ্যম করলেন। কারণ, "বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশুদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া যাবে। সেটাই হবে ভিত্তি যার ওপর অন্যসব পদ্ধতিতে সুসমাচার প্রচারের সাফল্য আসবে।"[4.32]

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ডাফ রামমোহনের সাহায্য চাইলেন। রামমোহন

সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন—স্কুলের জন্য বাড়ী দেখে দিলেন, ছাত্র জোগাড় করে দিলেন। 13ই জুলাই, 1830 বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বাইবেল পাঠের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তিনি বললেন, উইলসনের মত খৃষ্টান হিন্দুশাস্ত্র পড়েও হিন্দু বনে যাননি। আমি নিজে একাধিকবার কোরাণ পড়েছি, কিন্তু তার জন্য কি আমাকে মুসলমান হতে হয়েছে? এমনকি বাইবেল পড়েও আমি খৃষ্টান হইনি। তাহলে তোমরা তা পড়তে ভয় পাচ্ছ কেন?

ভারত পথিকের উপর সমস্ত সম্মান রেখেও বলতে হয় তাঁর কথাগুলি যুক্তিযুক্ত ছিল না। তাঁর মত মনীষা পৃথিবীর কজনের ছিল? তিনি দেশের সমস্ত লোককে নিজের তুল্য ভাবলেন কী করে? পরবর্তী ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয়, তার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। তাছাড়া হিন্দুধর্মে ধর্মান্তর-করণের প্রক্রিয়া নেই, উপরন্তু এ ধর্মে জাতিবিভাগ আছে। উইলসনদের ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ থাকলে অনেক উইলসনই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতো। এখন অনেক সাহেব বৈষ্ণব হচ্ছে। তাছাড়া ধর্মান্তরের ব্যাপারে সম্প্রসারণবাদী সেমীয় ধর্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক হিন্দুধর্মের তুলনা চলে না।

কলকাতায় এসে ডাফ দেখলেন, তাজ্জব ব্যাপার! ডিরোজিওর প্ররোচনাতে হিন্দুসমাজের রত্নতুল্য হিন্দু কলেজের কিশোর ছাত্ররা গোমাংস খাচ্ছে, হিন্দুধর্ম নিপাতের ধ্বনি তুলছে!

ডাফ নিজেই লিখেছেন,…আমরা এই পরিস্থিতিকে অভিবাদন জানালাম। কারণ এই রকম পরিস্থিতির জন্য আমরা বহুদিন ধরে প্রত্যাশা করছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম আর প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।…যথেষ্ট যে শত্রুরা তাদের দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে…

["…We rejoiced in June 1830 when, in the metropolis of British India, we fairly came in contact with a rising body of natives who had learned to think and discus all subjects with unshackled freedom—though that freedom was ever apt to degenerate into license in attempting to demolish the claims and pretentions of the Christian as well as every other professedly revealed faith. We hailed the circumstance, as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed. We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era—an era that introduced something new into the

hitherto undisturbed reign of a hoary and tyrannous antiquity ···Enough that the enemy has at length been shaken out of his impregnable security—that he is urged to sound the trumpet of alarm—that he is compelled to rally his scattered and long slumbering forces and that he finds himself necessitated to prepare for the toil and the fierceness of a mighty conflict ।"]

অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ ঘোলা জলে মাছ ধরতে বসে গেলেন। ব্যাপারটা মাছ ধরাই, বাঘ শিকার নয়। বাঘ শিকারের সময়ে বাঘ ও মানুষের পায়ের তলায় একই মাটি থাকে। মানুষ বাঘ শিকার করে। আবার মাঝে মাঝে বাঘের শিকারও হয়ে যায়। কিন্তু মাছ কোনও দিন মানুষ শিকার করে না। কারণ, একজনের দেহের তলায় জল, অন্যজনের পায়ের তলায় মাটি। অন্যধর্মের লোকদের হিন্দু বানানোর কোনও পদ্ধতি সমসময়ে উদ্ভাবিত হয়নি। ছিল শুধু ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সধর্মে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি।

মাছ শিকারের জন্য টোপের দরকার। ডাফ ওয়েলসলী অঞ্চল থেকে উঠে এলেন হিন্দু কলেজের খুব কাছে মির্জাপুর অঞ্চলের একটি বাড়ীতে। তিনি স্থির করলেন, তাঁর বাড়ীর একতলার বড় ঘরটিতে নিয়মিত ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য জনসভার আয়োজন করবেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অবস্থা দেখে সঙ্গত কারণেই আশা করলেন, ছাত্ররা দলে দলে বক্তৃতা শুনতে আসবে। নিজেদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ থাকলেও কলকাতার প্রটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারীরা ডাফের পরিকল্পনাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং একত্র হয়ে গেলেন। ঠিক হলো প্রথম চারদিন চারটি বক্তৃতা দেওয়া হবে। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির মিঃ হিল ও মিঃ অ্যাডাম, ওল্ডমিশন চার্চের মিঃ টমাস ডিয়ালট্রি এবং ডাফ বক্তৃতা দেবেন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার ডিয়ালট্রি হলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভূক আর্চডিকন: ভারতের হিন্দুমুসলমানের দেওয়া কর থেকে তাঁকে বার্ষিক দুহাজার পাউণ্ড বেতন দেওয়া হতো।

1830 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পাদ্রী হিল তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি দিলেন। হেয়ার বিরোধিতা করলেও ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের উৎসাহিত করলেন বক্তৃতা শোনার জন্য এবং ছাত্ররা দলে দলে উপস্থিত হলো ডাফ-ভবনে। ফলে প্রথম বক্তৃতাই শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিভাবকরা তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্দেশজারী করলেন, ভবিষ্যতে এধরনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তৃতা শুনতে

গেলে ছাত্রদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

মাছের টোপে কেরোসিন পড়লো। ফলে ডাফ বক্তৃতাই বন্ধ করে দিলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কাছে গেলেন হিন্দু কলেজের পরিচালকদের বিরুদ্ধে দরবার করতে। কারণ হিন্দু কলেজ তো সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু বেন্টিঙ্ক ব্যক্তিগতভাবে ডাফের প্রয়াসকে সমর্থন জানালেও গভর্ণর জেনারেল হিসাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিবাদ করতে রাজী হলেন না।

শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দু কলেজের পরিচালকদের এই নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে লিখেছেন, "এই আদেশ প্রচার হইলে চারিদিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার ওপর এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।"

রামতনু জীবনীকার শিবনাথ শাস্ত্রীর জেহাদী আলেকজাণ্ডার ডাফ সম্বন্ধে কতোটা ধারণা ছিল তা জানিনা, তবে সে সময়ে ভারতীয়দের স্বাধীন চিন্তা যে প্রকাশ করতে দেওয়া হতো না তার প্রমাণ তো 1823 খৃষ্টাব্দের প্রেস আইন। ওই আইনের জন্য রামমোহন রায় তাঁর 'মিরাত-উল-আখবর' বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। 'মিরাত-উল-আখবরের' সহ সম্পাদনা করার জন্য বাকিংহামকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। আর বার্কিংহামকে দেশে পাঠানোর অব্যবহিত কারণ, তিনি পাদ্রী রেভারেণ্ড ব্রাইসের সম্বন্ধে লিখেছিলেন, একজন পাদ্রী কি করে বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, বা সরকারী চাকরী করতে পারেন? এছাড়া খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু লিখলে যে কোনও উইরোপীয়ই যে বিনা দ্বিধায় দেশীয়দের বেত্রাঘাত করতো সে সংবাদ সংবাদপত্রের পাতাতে পাওয়া যায়। 20.5.1259 সনের 'সংবাদ প্রভাকরে' এমনই এক ঘটনার কথা বিবৃত আছে।[4·33]

এছাড়া মনে রাখতে হবে ধর্মীয় আলোচনার সময় আলেকজাণ্ডার ডাফ অভদ্র, অসংযত ও যুক্তিহীন ভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করতেন। ডাফ তাঁর 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মিশন' গ্রন্থে হিন্দুধর্মকে সরাসরি মিথ্যা ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। খৃষ্টধর্মের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেছেন "Unlike Christianty, which is all spirit and life, Hinduism is all letter and death." হিন্দুদের দেবী সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতেও তাঁর বাঁধেনি। কালীর রূপ নিয়ে তিনি কুৎসা গেয়েছেন। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের কিশোর ডিরোজিও শিষ্যদের 'স্বাধীন চিন্তার' ওপর পক্ষপাতিত্ব কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।

ডিরোজিওর বন্ধু গ্রাণ্ট তাঁর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকাতে হিন্দুকলেজের পরিচালক বর্গের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন, "কিন্তু খৃষ্টীয় সমাজ ও খৃষ্টান

সরকার সরকারী অর্থে পালিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এধরনের খৃষ্টধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ সহ্য করবে না"।[4.34] পত্রিকাটি হিন্দু কলেজের পরিচালকদের এই আদেশকে 'অত্যাচারী,' 'অবাস্তব,' 'হাস্যকর' ইত্যাদি বলে ডাফ, হিল প্রভৃতিকে তাঁদের বক্তৃতামালা পুনরায় সুরু করতে বললো। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বক্তৃতায় যোগ দিতে আহ্বান জানালো সবরকম নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ইণ্ডিয়া গেজেটের এই লেখাটির সঙ্গে ডিরোজিওর লিখন শৈলীর গভীর সাদৃশ্য ডিরোজিওর জীবনীকার এডওয়ার্ডসের চোখে পড়েছে। তাছাড়া পূর্বোক্ত বক্তৃতা মালার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ডিরোজিও যে এর প্রতিবাদ করেছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী তা জানিয়েছেন। সমস্ত দিক বিচার করলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে গ্রান্টের পত্রিকার প্রবন্ধটির আসল লেখক ডিরোজিও।

ডাফের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের ছেলেদের কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। অসুস্থতার অজুহাতে বিরাট সংখ্যক ছাত্র অনুপস্থিত থাকতে লাগলো। এ সম্বন্ধে তৎকালীন পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছে, "আমরা শুনিয়াছি 450 / কিম্বা 460 জন বালক ওই কলেজে পাঠার্থে আসিত, এক্ষণে প্রায় দুইশত বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে।"

এ অবস্থা সম্বন্ধে প্যারিচাঁদ মিত্র লিখেছেন[4.35] "ডিরোজিও সৃষ্ট আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ছিল। এর ঢেউ উঁচু ক্লাশের প্রতিটি ছাত্রের বাড়ীতে পৌঁছলো। হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, গোঁড়ামী নিপাত যাক—এই চিৎকার সর্বত্র শোনা যেতে লাগলো। হিন্দুধর্মকে উপহাস করার ব্যাধি উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের থেকে নীচু ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হলো। তারা মন্ত্র উচ্চারণ করার বদলে ইলিয়াড থেকে আবৃত্তি করতে লাগলো। কেউ কেউ গায়ের পৈতা ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। গোঁড়া পরিবার গুলিতে ত্রাসের সঞ্চার হলো। কলেজ যাওয়া বন্ধ হলো ছাত্রদের।" সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে লাগলো, হিন্দু কলেজ শুধু অহিন্দু কার্যকলাপেরই কেন্দ্র নয়, খৃষ্টান তৈরীরও কারখানা।

স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুকলেজের পরিচালক বর্গ এগিয়ে এলেন তাঁদেরই সৃষ্টি করা হিন্দু কলেজকে রক্ষা করতে। ডিরোজিওর ইউরেশীয় অভিসন্ধি তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, এরকম প্রমাণ আমাদের হাতে নেই; কিন্তু ডিরোজিও যে সব অনিষ্টের মূল এটা তো দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সুতরাং যেন তেন প্রকারেন ডিরোজিওকে বিদায় করাই কর্তব্য। এটা কোনও অযৌক্তিক কাজও নয়। প্রতিষ্ঠান বিরোধী কার্যকলাপ কোনও প্রতিষ্ঠানই সহ্য করতে পারে না। ইতিহাস বলে ডিরোজিওর কৃতকর্মের পরোক্ষ ফলরূপেই পরবর্তীকালে

বেশ কিছু শিক্ষিত বঙ্গসন্তান খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। একথা স্বীকার করেছেন ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস।

সুতরাং হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে এক সভায় মিলিত হলেন। শনিবার, 23শে এপ্রিল সভা বসলো পরিচালক মণ্ডলীর। ওই সভা সংক্রান্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হলো।[4·36]

সভায় উপস্থিত: গভর্ণর চন্দ্রকুমার ঠাকুর। ভাইস প্রেসিডেণ্ট হোরেস হেম্যান উইলসন। বাবু রাধামাধব ব্যানার্জী। বাবু রামকমল সেন। ডেভিড হেয়ার। বাবু রসময় দত্ত। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্মারকলিপি পাঠ করা হয়: সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো জনৈক শিক্ষকের অযাচিত ব্যবস্থা ও খারাপ কার্যকলাপের ফলে জাত ক্রমবর্ধমান অনিষ্ঠ ও জনত্রাস দমন করা। ওই শিক্ষকের প্রতি বহু ছাত্র অনুরক্ত এবং তিনি দেখা যাচ্ছে, তাদের নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ করেছেন, এবং কতকগুলি অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যার উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করা তথা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করা।

ব্যাপারটা প্রায় সকলেরই জ্ঞাত এবং তা বলার দরকার করে না। তাঁর কার্যকলাপের ফলে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্ততঃ 25 জন ছাত্র কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে। যাদের তালিকা পেশ করা হচ্ছে। 160 জনের মত ছাত্র অনুপস্থিত থাকছে, যাদের কয়েক জনকে অসুস্থ মনে করা হচ্ছে, কিন্তু অনেকেই বলেছেন এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে কলেজ ছেড়ে দেবেন, তাদের নামের তালিকাও পেশ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে অনেক কিছু শোনা গেছে এবং অনেক কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাপ্ত চিঠিগুলির বক্তব্য পড়ে এবং কয়েকজন পরিচালকের মতামত গ্রহণ করে নিম্নলিখিত নিয়ম এবং ব্যবস্থা বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে। ছেলেদের কলেজ থেকে নাম প্রত্যাহার সংক্রান্ত চিঠিগুলি পড়া হলো সভায়।

প্রস্তাবিত নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্পর্কে স্মারকলিপি:

1. মিঃ ডিরোজিও যেহেতু সকল অনিষ্ঠের মূল এবং জনত্রাসের কারণ, তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হোক এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হোক।

2. উঁচু ক্লাশের যেসব ছাত্রদের কু-অভ্যাস ও অনাচারের কথা জানা আছে এবং যারা ভোজসভায় উপস্থিত ছিল, তাদের বিতাড়িত করা হোক।

3. যেসব ছাত্ররা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম ও দেশের প্রচলিত আচারেরা বিরোধিতা করে তাদের আচরণে যদি এবম্বিধ প্রমাণ থাকে তো তাদেরও বহিঃষ্কার করা হোক।

4. কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার বয়স ও পঠন সীমা হবে 10—12 এবং 18—20

5. ভৎর্সনা করেও, যদি ছেলেদের শোধরান না যায় তবে তাদের শারীরিক শাস্তি দিতে হবে। ব্যাপারটা অবশ্য প্রধান শিক্ষকের মর্জির ওপরই ছেড়ে দিতে হবে।

6. ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছেলেদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ খবর না নিয়ে ছেলে ভর্তি করা হবে না।

7. ইউরোপীয়দের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাদের নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে।

9. ছুটির পরে কোনও ছাত্রকে কলেজে থাকতে দেওয়া হবে না।

10. কোনও ছাত্র ব্যক্তিগত সভা ও বক্তৃতায় যোগদান করলে তাকে বহিষ্কার করা হবে।

11. পাঠ্য বই-এর নাম এবং পঠন সময় নির্দিষ্ট করতে হবে।

12. ছাত্রদের নীতিবোধ ক্ষুন্ন করে এরকম বই কলেজে আনা, পড়া এবং শিক্ষা দেওয়া চলবে না।

13. ছাত্রদের ফার্সী ও বাংলা পঠনের জন্য আরও সময় ধার্য করতে হবে।

14. উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররা সংস্কৃত পড়বে।

15. যেসব ছাত্র লেখাপড়ায় ভাল, চরিত্রও ভাল এবং যাদের কলেজে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া কল্যাণকর বিবেচিত হবে, তাদেরই জলপানি দেওয়া হবে।

16. জলপানি গ্রহণেচ্ছু ছাত্রদের সংস্কৃত ও আরবিতে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

17. স্কুল সোসাইটি থেকে আগত ছাত্রদের যথানিয়মে ভর্তি হতে হবে। এখনও পর্যন্ত যে নিয়মে চলছে, সেই নিয়মে নয়। তারা কোন্ ক্লাশে পড়বে সেটা প্রধান শিক্ষকই স্থির করবেন।

18. দরজা বন্ধ করে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

19. কলেজের শিক্ষকদের ভোজনের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করতে হবে। স্কুলের টেবিলের ওপর তাদের খাওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করতে হবে।

এরপর 1 নং দফা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করে ভোটে দেওয়া হলো ঃ

"ছাত্রদের ওপর আপতিত প্রভাব থেকে যতটুকু জানা যায় তা থেকে পরিচালকবর্গ কি সঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে মিঃ ডিরোজিওর নৈতিক ও ধর্ম বিশ্বাসের দরুণ তিনি তরুণদের শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত ?"

এতে বাবু চন্দ্র কুমার ঠাকুর বললেন, রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া ডিরোজিওর শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। উইলসন বললেন, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষার কুফল কিছুই দেখেননি এবং তিনি ডিরোজিওকে একজন উচ্চমানের শিক্ষক বলে মনে করেন। বাবু রাধাকান্ত দেব বললেন, তিনি মনে করেন তরুণদের শিক্ষাদানের পক্ষে ডিরোজিও একেবারে অনুপযুক্ত। বাবু রসময় দত্ত বললেন, পেশ করা রিপোর্ট ছাড়া অন্য কোনও সূত্রে তিনি ডিরোজিওর কুকর্মের কথা জানেন না। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমাণাভাবে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ খারিজের পক্ষে। বাবু রাধামাধব ব্যানার্জী বললেন, পেশ করা রিপোর্ট দেখে মনে করেন শিক্ষাদানের পক্ষে ডিরোজিও একজন অনুপযুক্ত লোক। বাবু রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের অভিমতই সমর্থন করলেন। কিন্তু ডিরোজিওর ছাত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহের দৃঢ় বিশ্বাস, ডিরোজিও মোটেই অনুপযুক্ত লোক নন। ডেভিড হেয়ার মনে করেন ডিরোজিও একজন উঁচুদরের শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষাদানের ফলে ছাত্ররা লাভবান হচ্ছে।

এই সমস্ত মতদানের ফলে দেখা গেল অধিকাংশ পরিচালক ডিরোজিওকে শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে রাজী নন। তখন বিষয়টির নঞার্থক দিকটি বিবেচনায় এলো : কলকাতার হিন্দু সমাজের তৎকালীন মানসিক অবস্থাতে ডিরোজিওকে বরখাস্ত করা উচিত হবে কিনা।

বাবু চন্দ্র কুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং রাধামাধব ব্যানার্জী বললেন, বরখাস্ত করা প্রয়োজন।

বাবু রসময় দত্ত এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বললেন, এটা উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উপযুক্ত (expedient)।

দেশীয় মানুষদের মনোভাবের ব্যাপার বলে উইলসন ও ডেভিড হেয়ার মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকলেন।

তরুণ ডিরোজিও শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বললেন, বরখাস্ত করা অপ্রয়োজনীয়।

সুতরাং তাঁর সেবা ও গুণাবলী বিবেচনার পর ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

এরপর, পরবর্তী নিয়ম ও ব্যবস্থাবলী বিবেচনা করা হলো। স্থির করা হলো, 2নং ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয়। কারণ কলেজের নিয়ম অনুসারে কলেজ যে কোনও ছেলেকে বরখাস্ত করতে পারে।

3নং ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থির হলো ব্যাপারটা অভিভাবকদের ওপরেই ন্যস্ত করা যাক। তাঁরা যদি মনে করেন কলেজ হিন্দুধর্মের বিপক্ষে, তাহলে তাঁরা নিজ নিজ পুত্রকে কলেজ ছাড়িয়ে দিতে পারেন।

4 নং দফা অপ্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত হলো। গ্রহণ করা হলো 5 ও 6 নং দফা। 7 নং দফা গ্রহণ করা হলো নিম্নলিখিত ভাবে—

"ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইউরোপীয়দেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তাঁদের নৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্র বিবেচনা করে।"

"সন্তোষজনক কারণ ছাড়া" কথাটি যোগ করে 9নং দফাটি গ্রহণ করা হলো। 10 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো, এ ব্যাপারে পরিচালকদের কিছু করার নেই। বালকদের আচরণ তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। গ্রহণ করা হলো, 11 এবং 12 নং দফা, এবং 13 নংও। সঙ্গে শুধু যোগ করা হলো, কারুর বন্ধু-বান্ধবদের ইচ্ছে থাকলে তাঁরাও ভাষাটি শিক্ষা করতে পারেন। 14 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো, সংস্কৃত ও ফার্সী প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা এখনই পড়ে, কিন্তু ওই ব্যাপারে তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অগ্রগতি ঠিক আশাও করা যায় না। এ ব্যাপারে অগ্রগতির জন্য কি করা উচিত তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যাবে।

15 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো, এটি এখনই চালু আছে। 16 নং দফা সম্বন্ধে বলা হলো এ ব্যাপারে পরিচালকবর্গের কিছু করার নেই। কারণ ব্যাপারটা শিক্ষাদপ্তরের হাতে। ঠিক হলো হেয়ারের মতামত নিয়ে 17 নং দফা ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হবে। 18 নং দফা ভবিষ্যতে বিচারের জন্য রাখা হলো। গ্রহণ করা হোল 19 নং দফা।

উপরোক্ত বিবরণী পড়ে সহজেই উপলব্ধ হয় যে ডিরোজিওর কার্য-কলাপের ফলে বিশাল সংখ্যক হিন্দু ছাত্র বিগড়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য সরাসরি ডিরোজিওকে দায়ী করা যাচ্ছেনা। ডিরোজিও ক্লাশরুমের বাইরে সভাসমিতিতে বা নিজের বাড়ীতে ছাত্রদের কী শেখাতেন, তার কোনও লিখিত প্রমাণ হিন্দু-কলেজের পরিচালকবর্গের হাতে নেই। কিন্তু কলেজের পতনোন্মুখ অবস্থার জন্য যে ডিরোজিও পরোক্ষভাবে দায়ী, সেটা অবিসংবাদিত সত্য। পরিচালক-বর্গ সরাসরিভাবে ডিরোজিওকে অনুপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন করতে পারলেন না। কারণ, শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর যোগ্যতা সংশয়াতীত। তায় পরিচালকবর্গের একজন ডিরোজিওরই ছাত্র। সুতরাং তাদের পক্ষে ডিরোজিওকে পরোক্ষভাবে দায়ী করে বিদায় করা ছাড়া গত্যান্তর রইলো না। কারণ, বৃটীশ আমলে বেয়াড়া শিক্ষকদের বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মারার চল ছিল না।

এছাড়া কার্যবিবরণী থেকে পরোক্ষভাবে বোঝা যাচ্ছে খৃষ্টান শিক্ষকেরা স্কুলের টেবিলেই গোমাংস সহযোগে আহার সারতেন। তরুণ ছাত্ররা শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হতেন স্বাভাবিকভাবেই। সেজন্য শিক্ষকদের

আলাদা খাবার ঘরের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে পরিচালকবর্গের।

সুশোভনচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধে পরিচালক মণ্ডলীর সভার 8 নং দফা দেখা যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকারের কোনও মন্তব্যও নেই। সুবীর রায় চৌধুরী[4.37] বলেছেন, ভুল করে 7 নং এর পরে 9 নং দফা লেখা হয়েছে। সেটা হলে দফাওয়ারী আলোচনার সময় সেটা নিশ্চয় উল্লিখিত হতো। তা হয়নি ; বিনয় ঘোষ বলেছেন 8 নং প্রস্তাবটি কলেজ রেকর্ডে নেই।[4.38] আমাদের সন্দেহ, 8 নং দফা নিশ্চয় একটা ছিল, সেটা অধ্যাপক সরকার বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে 7ই মে 1831 তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকায়' যে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি হলো, "হিন্দু কলেজের বিষয় আমরা অবগত হইলাম যে গত 23শে এপ্রিল শনিবার কর্মাধ্যক্ষদিগের কলেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনার নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে…শ্রীমাধবচন্দ্র মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি ছাত্র ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমন কুকর্ম আর করিব না এবার অপরাধ মার্জনা কর।"[4.39]

এর থেকে সন্দেহ হয় 8 নং দফায় মাধব মল্লিকের প্রসঙ্গ ছিল। আবার সুরেশচন্দ্র মৈত্র[4.40] "হিন্দু কলেজের হস্তলিখিত কার্যবিবরণী" থেকে 8 নং দফায় (ইংরেজী) "বিকেলের ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া হোক" লিখেছেন। কিন্তু দফাওয়ারী আলোচনার সময় 8 নং দফা দেখাননি। কিন্তু বাংলায় লিখেছেন, "7 নং ও 8 নং কলেজ চালাবার সাধারণ কয়েকটি নিয়ম সংক্রান্ত।" সুতরাং সন্দেহ নিরসন হচ্ছেনা।

কলেজের পরিচালকমণ্ডলী সঙ্গে সঙ্গেই ডিরোজিওকে বরখাস্তের চিঠি পাঠালেন না। হোরেস উইলসন এক চিঠিতে ডিরোজিওকে সভার সিদ্ধান্ত জানিয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ পত্র পেশ করা জন্য অনুরোধ জানান। ওই চিঠিতে উইলসন লিখেছিলেন, পরিস্থিতি সহজ হলে ডিরোজিও চাকরী ফেরত পেতে পারেন।

তার উত্তরে ডিরোজিও পদত্যাগ পত্র পাঠান কলেজ পরিচালকমণ্ডলীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে উইলসনকে একটি চিঠিতে লেখেন : আপনার কথামত এই চিঠির সঙ্গে পদত্যাগ পত্র পাঠালাম। পত্রখানি পড়লেই দেখতে পাবেন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ আমি যথাযথভাবে রাখতে পারিনি। আমার শিক্ষকতার জন্য কলেজের কোনও অনিষ্ট হয়েছে বলে যদি আমি মনে করতাম, অথবা তার সপক্ষে যদি কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকতো, তাহলে আমার দিক দিয়ে বিনা প্রতিবাদে পদত্যাগ করার যুক্তি আমি অবশ্যই মেনে নিতাম।

কিন্তু এতখানি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে একটা সাময়িক ঘটনাবলীর আঘাত সহ্য করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আপনারা আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন, একথা আমি কি করে অস্বীকার করবো? নির্বিবাদে পদত্যাগ পত্র পাঠানো তাই কোনও মতেই সম্ভব হলোনা। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি, আপনি যে এই অনুরোধ আমার সম্মান রক্ষার জন্যই করেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু সেই সান্ত্বনায় আমার অপমান-বেদনার উপশম হচ্ছে কোথায়? প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি পদচ্যুত করে আমাকে অপমান করাই সাব্যস্ত করেন, তাহলে আমি মনে করি, আমারও সে অপমান সহ্য করার মত শক্তি থা:া বাঞ্ছনীয়।

কলেজের কয়েকজন হিন্দু পরিচালক আমার বিরুদ্ধে যে অসংযত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন তা সহজে শান্ত হবে বলে বোধ হয় না। অতএব কলেজে পুনরায় শিক্ষকের পদ গ্রহণের সম্ভাবনা আপাততঃ দেখছি না। তাছাড়া কর্মজীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনে হয়তো আর আপনার সান্নিধ্যলাভের সুযোগই হবে না। তাই এই সুযোগে আপনার কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কলেজে চাকরী করার সময়ে আপনার কাছ থেকে যে হার্দিক ব্যবহার পেয়েছি, তা জীবনে কখনও ভুলবো না।

সঙ্গের পদত্যাগপত্রে ডিরোজিও হিন্দুকলেজের পরিচালকবর্গকে অভিযুক্ত করলেন তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়ার জন্য। অভিযোগ করলেন, "আমি জেনেছি পরিচালক মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই আমাকে কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পক্ষে অযোগ্য মনে করেননি। তা সত্বেও আমাকে অভিযুক্ত না করে, আমাকে পরীক্ষা না করে, আমার বক্তব্য না শুনে, একটা বিচারের প্রহসন না করেই আমাকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।"

ডিরোজিওর চিঠির উত্তরে উইলসন লেখেন: মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, তবু কলেজের হিন্দু পরিচালকদের সম্পর্কে এতটা রূঢ় মন্তব্য না করলেই পারতেন। বাস্তবিক পক্ষে তাদের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। অবস্থাগতিকে সমাজের প্রতিক্রিয়ার কাছে তাঁরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছেন। তদন্ত ও ন্যায়সঙ্গত বিচার বিবেচনা করার অবকাশ পাননি তাঁরা। সভায় আপনার ব্যক্তিগত নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনা তেমন করা হয়নি। কলকাতার লোকের বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মনে আপনার সম্পর্কে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, যা কলেজের পক্ষে সত্য সত্যই ক্ষতিকর হচ্ছে। সেই ধারণার সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য তথ্য প্রমাণ ঘেঁটে বা সাক্ষীসাবুদ ডেকে জেরা করে

বিশেষ কিছু লাভ হতো না। আমার ধারণা, এখনও ঘরোয়াভাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। মনে হয়, বেশ কিছুদিন ধরে তা চলবে।

আপনার বিরুদ্ধে তিনটি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্নাকারে আপনাকে আমি জানাচ্ছি। প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি বাধ্য নন। আপত্তি না থাকলে উত্তর দেবেন।

আপনি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন ?

আপনি কি মনে করেন, পিতামাতার আদেশ পালন করা বা তাদের শ্রদ্ধাভক্তি করা নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না ?

আপনার মতে ভাইবোনেব বিবাহ কি সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য নয় ? এইসব বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আপনি স্বাধীনভাবে আলাপ করেন কি ?

আমি জানি, আপনাকে এসব প্রশ্ন করার কোনও অধিকার আমার নেই। আপনাকে এগুলি লিখে জানালাম, আপনার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের অসন্তোষের কারণ কী এবং জনসাধারণের মধ্যে কী ধরনের গুজব রটনা হয়েছে, তারই একটু আভাষ দেওয়ার জন্য। এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা সাহস করে বলতে পারলে আমি নিজেই খুশী হতাম। আপনার কোনও যুক্তিপূর্ণ জবাব পেলে তা আমি অধ্যক্ষদের কাছে পেশ করে নিশ্চিত হতে পারি।

দেখা যাচ্ছে উইলসন ডিরোজিওর অভিযোগের জবাব অনেকটাই দিয়েছেন। পরিস্থিতি এমনই ছিল যে ডিরোজিওকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া না দেওয়া সমান। ডিরোজিওকে কলেজে রাখা সম্ভব ছিল না।

উইলসনের চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন ডিরোজিও, সেই চিঠিটির উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং সেই চিঠির নিরিখেই ডিরোজিওকে নিষ্পাপ, যুক্তিবাদী ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করা হয়। ভুলে যাওয়া হয় যে যে কোনও কর্মচ্যুত ব্যক্তিই তাঁর কৃতকর্মের সাফাই গাইবেনই। দীর্ঘ চিঠিটির অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

গতকাল সন্ধ্যায় পাওয়া আপনার চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু জরুরী কাজের জন্য তা পারিনি। সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার প্রতি আপনি এখনও যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি দুঃখিত যে আমার ব্যক্তিগত মত ও আচরণ সমর্থন করে যে উত্তর দিচ্ছি তা আপনার পক্ষে কষ্টকরভাবে দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবুও আমি নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বলে, যে আপনার মত একজন বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি যা সত্য হলে আমার চরিত্রহানি ঘটতে পারে। আমার বন্ধুদের আমার কোনও রকম অমঙ্গল

আশঙ্কা করার প্রয়োজন নেই। আমার স্বচ্ছ দৃষ্টিই আমার নিরাপত্তা এবং সান্ত্বনা।

১. **আমি কারোর কাছেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিনি।** যদি এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা দোষের হয়, তাহলে আমি দোষী; কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি ভীত বা লজ্জিত নই যে এ বিষয়ে দার্শনিকদের সন্দেহ আছে। কারণ আমি সন্দেহ নিরসনের কথাও বলেছি। এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা কি অন্যায়? তাই যদি হয় তাহলে এইসব প্রশ্নের যে কোনও একদিকের হয়ে কথা বলাও অন্যায়। অথবা এক আলোক প্রাপ্ত জাতির পক্ষে কি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একটি মাত্র দিকে নিবদ্ধ হয়ে অন্য দিকটা সম্বন্ধে চোখ কান বন্ধ করে থাকা স্বাস্থ্যকর?

কোনও একটি মতকে কী করে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, বিপরীত মতটির উল্লেখ করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করলে? এছাড়া আমি কী করেছি? তরুণ ছাত্রদের শিক্ষার ভার কিছুদিনের জন্য প্রাপ্ত হয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একটি মাত্র দিক দেখিয়ে গোঁড়া ও আধা জ্ঞান সম্পন্ন করতে চাইনি। কারণ এ ধরনের শিক্ষা শুধু মনকে সংকীর্ণ করে তাই নয়, তরুণদের মানসিক শক্তি ও গুণাবলীরও ক্ষতি করে এবং আমার বিপক্ষে যাই বলা হোক না কেন, আমি আমার কর্মপদ্ধতির সমর্থনে লর্ড বেকনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তির মত উল্লেখ করতে পারি। লর্ড বেকন বলেছিলেন, কোনও মানুষ যদি নিশ্চয়তা দিয়ে সুরু করে তবে তার অনুসন্ধিৎসা শেষ হবে সংশয়ের মধ্যে। তাতে আমার কদাচিৎ দেখার প্রয়োজন হয়েছে যে এটাই সর্বদা ঘটে থাকে, যখন সন্তুষ্ট চিত্তে সন্দেহের দোলা লাগে। এক সংশয় থেকে আর এক সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বিশ্বজনীন সন্দেহবাদে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম কয়েকজন ছাত্রকে হিউম লিখিত ক্লিনথেস ও ফিলোর কথোপকথনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। যাতে আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও শানিত যুক্তি আছে। কিন্তু আমি তাদের ডঃ রীড ও ডুগাল স্টুয়ার্টের প্রদত্ত হিউমের বক্তব্যের তীক্ষ্ন প্রত্যুত্তরের কথাও বলেছি—প্রত্যুত্তর, যার এখনও কেউ প্রতিবাদ করেনি। এটাই আমার অপরাধের মোর্দা কথা। আমার শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ধর্মবোধ যদি নড়ে গিয়ে থাকে তার জন্য আমি দায়ী নই। ছাত্রদের প্রত্যয় উৎপন্ন করা আমার সাধ্যাতীত। যদি কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমাকে দায়ী করা হয় তাহলে কয়েকজনের আস্তিকতার জন্যও সাধুবাদ আমি দাবী করতে পারি। সত্যকথা বলতে কি মহাশয়, মানুষের অজ্ঞতা ও মতবাদের অনবরত পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি এত বেশী সজাগ যে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়েও আমি কখনও একটি নির্দিষ্ট মত

প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসু মনের মধ্যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা মনকে ঘিরে রাখার জন্য মতান্ধতার সাহসিকতাও প্রবেশ লাভ করে না। একথা আমি কখনও বলতে পারি না যে এটা সত্য বা ওটা সত্য নয়। কারণ, বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে ওতোপ্রত পরিচয়ের পরে এবং মনীষার সবচেয়ে সাহসী উত্তরনের পরেও আমাদের দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত, নম্রতাই সবচেয়ে বড় জ্ঞান, কারণ সবচেয়ে বড় জ্ঞান মানুষকে তার অজ্ঞানতার কথাই সুনিশ্চিত করে।

২. আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পিতামাতার আদেশ পালন করা ও তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি করা আমি নৈতিক কর্তব্য মনে করি কিনা? জীবনে প্রথম আপনার চিঠি থেকে জানলাম যে, এ ধরনের ভয়ানক অতিপ্রাকৃত ও ঘৃণ্য ধারণা অপরের মনে প্রবিষ্ট করার অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের নোংরা অভিযোগের অভিযোগকারীরা আমার ঘৃণা পাবারও যোগ্য নয়। আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এই ধরনের কেচ্ছা রটনাকারীদের জবাব দিয়ে বলতেন আমার মত যারা পিতামাতার প্রতি যথা কর্তব্য পালন করে তারা এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু আমার মা সাক্ষ্য দিতে পারেন, এই ধরনের অভিযোগ আমার আচরণের সঙ্গে কি রকম অসঙ্গতিপূর্ণ। এবং তাঁর সাক্ষ্যের ওপর আমাকে সমর্থন করা বা না করা ছেড়ে দিতে পারি। তা হলেও আমি এখানেই থামছি না। এ ধরনের মতামত লালন করা তো দূরের কথা, আমি সর্বদাই পিতামাতাকে ভক্তি করার কথা বলে এসেছি। অনেকে আবার পিতা-মাতার প্রতি শুধুমাত্র ভক্তির ভান করে। আমি সেইসব ছাত্রদের এই ধরনের মনোভাবের নিন্দা করে এসেছি। যেহেতু এগুলি ভণ্ডামী এবং ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু আমি সর্বদাই হৃদয়ের সংবেদনশীল অনুভূতি-গুলো লালন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে। পিতামাতার প্রতি যে আমি শ্রদ্ধা পোষণ করতে বলি এরকম ঘটনার উদাহরণ বিরল নয়। আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি এরকম দুটি ঘটনার কথা বলবো। আপনি আমার কথা যাচাই করে নিতে পারেন— যেহেতু ঘটনার পাত্রপাত্রীদের যে কোনও সময় হাজির করা যায়।

দু তিন মাস আগে দক্ষিণা রঞ্জন মুখার্জী (সম্প্রতি যাকে নিয়ে কলকাতায় বেশ সাড়া পড়ে গেছে) আমাকে জানায় যে তার পিতার ব্যবহার তার কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গৃহত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও তার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না তবুও আমি তাকে এই ধরনের পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করলাম এবং বললাম যে পিতামাতার অনেক

কিছ সহ্য করা উচিত, না তাড়িয়ে দেবার আগেই যদি তুমি ঘর ছাড় তবে লোকে তোমাকে সমর্থন করবে না। সে আমার উপদেশ গ্রহণ করলো, যদিও, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, অল্প সময়ের জন্য। কয়েক সপ্তাহ আগে সে বাড়ী ছেড়েছে এবং আমার বাড়ীর কাছাকাছি সে একটা ঘর নিয়েছে। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করার পরেই সে আমাকে ঘটনাটা জানায়। তখন আমি তাকে জিগেস করলাম, এ ধরনের পদক্ষেপ নেবার আগে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেনি কেন, সে উত্তর দিল, "কারণ আমি জানি, আপনি কাজটাতে বাধা দেবেন।"

অন্য উদাহরণ মহেশচন্দ্র সিংহের। পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং কয়েকজন আত্মীয়কে চটিয়ে মামা উমাচরণ বসু এবং কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে সে আমার বাড়ীতে এসেছিল। আমি তাকে বকলাম এবং বললাম, বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে তার সঙ্গে আমি কথা বলবো না। অন্য আরও উদাহরণ আমি দিতে পারি, কিন্তু এই দুটিই বোধহয় যথেষ্ট।

৩. আপনার তৃতীয় প্রশ্ন, ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ আমি নির্দোষ এবং যোগ্য বলে মনে করি না? আমার সুনির্দিষ্ট উত্তর হচ্ছে, না। এবং এই ধরনের বিদঘুটে শিক্ষা কাউকে দিইনি। কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, এই ধরনের কুৎসা কি করে চালু হলো। আমি যাদের সঙ্গে এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, তারা এই ধরনের অসত্য কথা প্রচার করবে না। অন্ততঃ আমি ভাবতে পারি না যে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এমন কেউ মূর্খ আছে, যে আমার কথা না বুঝে এইসব কথা রটনা করবে, বা তাদের মধ্যে কেউ এমন ধূর্ত আছে যে আমার মুখের কথা বিকৃত করবে। বরং আমি বিশ্বাস করি কিছু দুর্বল প্রকৃতির লোক ভীত হবার মত কোনও উপকরণ না পেয়ে আমার বিরুদ্ধে এইসব অপবাদ দিয়ে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছে। আমাকে সন্দেহবাদী বা বিধর্মী বললে আমি বিস্মিত হইনা। কারণ, ধর্ম নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের এ ধরনের বিশেষণ প্রাপ্য। কিন্তু যে ধরনের অপবাদের কথা ভাবা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ সেই ধরনের অপবাদ যে আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার চিঠি থেকেই আমি প্রথম জানলাম। আমি বিশ্বাস করি আপনার সহায়তা এইসব হাস্যকর গল্পকে ডাহা মিথ্যা বলে নস্যাৎ করবে। আমি নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয় সবকিছু জানিনা। তবু লোকে আমার সম্বন্ধে যা বলে তার থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমি বহুলোক থেকে ভয়ঙ্কর নই। আমি জানি বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কিছু লোক অদম্য উৎসাহে আমার সম্বন্ধে ভিত্তিহীন ও অসম্ভব গালগল্প তৈরী করেছে। এবং আমার পরিবার সম্বন্ধে কিছু নির্বোধ

উর্বর মস্তিষ্ক বলছে, আমার বোনের সঙ্গে (কেউ বলেছেন আমার মেয়ের সঙ্গে, যদিও আমার কোনও মেয়ে নেই) এক হিন্দু যুবকের বিয়ে হবে। এই রটনার মূলে আছে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যার কাজ হলো, নানা গুজব সৃষ্টি করে দিনের খবর হিসাবে লোকের বাড়ী ফেরী করা। অবশ্য এটা চিন্তা করে সুখী হওয়া যায় যে গুজব যতই মুখরোচক হোকনা কেন, মোটেই চিরস্থায়ী নয়।

এখন আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর আমি দিলাম। এখন প্রিয় মহাশয়, আপনি আমাকে অনুমতি করুন জিজ্ঞাসা করতে, জনরবের প্রতি কলেজের দেশীয় পরিচালকরা আত্মসমর্পন করে আমার প্রতি কী সুবিচার করলেন? তাঁদের সভার কার্যবিবরণীতে লোকটিকে বরখাস্ত করার মত কাজ ও চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় কোনও বাক্য লিপিবদ্ধ হয়নি, যখন জনরব তাঁর বিরুদ্ধে? আমাকে নিয়ে কেবল অস্পষ্ট অভিযোগ ও গুজব রটনা করা হয়েছে। দেশীয় পরিচালকবর্গ আমার বিরুদ্ধে যা করলেন তাতে এইসব গুজবই সমর্থিত হলো। আমাকে একথা উচ্চারণ করার জন্য ক্ষমা করবেন, যে আমি বিশ্বাস করি আমার থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ওঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন—জনরব নয়, নিজেদের গোঁড়ামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। **তাঁরা যদি আমার ধর্ম ও নীতিবোধ নিয়ে তদন্ত করে দেখতেন, তাহলে তাঁদের আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও হেতুই ছিলনা**। সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন, কোনওরকম তদন্ত করার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন, ক্রোধ ও হটকারিতার সঙ্গে আমাকে প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়ণ। যে রকম কদর্যভাবে তারা এই কাজটি করেছেন, তা তাঁদের প্রগতি বিরোধী মানসিকতাকে ভালোভাবেই সূচিত করে। কারণ ক্রোধের বশে তাঁরা স্বাভাবিক শালীনতা বোধও ভুলে গেছেন। ব্যাপারটা যাঁরাই শুনেছেন তাঁরা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। তবে তাঁদের অবিচারের প্রতিবাদ করা মানে তাঁদের প্রাপ্যের অধিক মূল্য দেওয়া।

চিঠির শেষে দীর্ঘ চিঠির জন্য আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি; এর সঙ্গে পুণর্বার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই অপ্রিয় ঘটনার ব্যাপারে আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য।"

ডিরোজিওর সাফাই গাওয়া চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম অংশে ডিরোজিও বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর সমস্ত আলোচনাই ছিল অ্যাকাডেমিক—ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের বাদানুবাদই তিনি ছাত্রদের পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু একজন ব্যক্তি মানুষ সারাক্ষণ ধরে কলেজের ক্লাশে, ক্লাশের বাইরে, নিজের বাড়ীতে ইউরোপীয় দার্শনিকদের ঈশ্বর সম্পর্কে মতামত আলোচনা করছেন

কয়েক বছর ধরে—অন্য কিছু আলোচনা করছেন না, এবং তার ফলে ছাত্ররা হিন্দুধর্মদ্বেষী গোমাংসলোলুপ হয়ে উঠছে, এটা আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। কারণ ইউরোপীয় দর্শন ডিরোজিওর পরে শত শত শিক্ষকই পড়িয়েছেন, শত শত হিন্দু ছাত্র তাদের কথা শুনেছেনও। কিন্তু তারা হিন্দুধর্ম নিপাতের শ্লোগান তোলেননি। হিন্দুধর্ম নিয়ে যে ডিরোজিওর মত ইউরেশিয়ানদের বিলক্ষণ মাথাব্যথা ছিল, তা 'ক্যালিডোস্কোপে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে দেখা যাচ্ছে। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে ডিরোজিওর ছিল বাইবেল সম্মত প্রচণ্ড বিরাগ। ছাত্রদের কাছে যে তিনি সর্বদা হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই। রাজনারায়ণ বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেবের রচনায় তাঁর প্রমাণ আছে যথেষ্ট।

সুতরাং অভিযোগ প্রমাণের উপায় না থাকলেও রাধাকান্ত দেবদের অভিযোগ অমূলক নয়। আমরা দেখি, অনতিবিলম্বে ডিরোজিওর শিষ্যরা উপলব্ধি করেছিলেন স্বধর্ম নিয়ে বিধর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্যাপারটা শাঁখের করাতের মত, যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। তাই দেখি 1838 খৃষ্টাব্দে তাঁরা যখন 'সাধারণ জ্ঞানার্জিকা সভার' প্রতিষ্ঠা করেছেন তখন সভার ঘোষণাপত্রে লিখেছেন, ধর্ম নিয়ে সভায় কোনও আলোচনা হবেনা। অথচ ডিরোজিওর প্ররোচনাতে যখন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন সেই সভাতে প্রায়ই পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনা হতো, হিন্দুধর্ম নিপাতের শ্লোগান উঠতো। এবং বলা বাহুল্য, সেই সভাতে খৃষ্টধর্মের কোন বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা কখনই হতোনা। কারণ ডিরোজিওদের কাছে খৃষ্টধর্ম ছিল মূর্তিমান সত্য!

উপরোক্ত চিঠিতে লিখেছেন ডিরোজিও, "তরুণ ছাত্রদের···গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের একটিমাত্র দিক দেখিয়ে গোঁড়া ও আধাজ্ঞান-সম্পন্ন করতে চাইনি।"

এখানে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে, হিন্দু ছাত্রদের দর্শন পড়াবার সময় কি তিনি হিন্দু দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন? হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিষোদ্গার করার আগে তিনি কি হিন্দু শাস্ত্র, মহাকাব্য ইত্যাদির কথা জ্ঞাত করিয়েছিলেন? না করেননি। কারণ জেণ্টুদের[0.10] ধর্ম-সাহিত্য-ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর কোনও শ্রদ্ধাবোধ যে ছিল না, তা আমাদের সুগোচর।

আসলে সমসাময়িক কিছু বিকৃত প্রথা (ইংরেজীতে যাকে বলে Tradition) দেখে তাঁর খৃষ্টান-সুলভ পৌত্তলিকতাবিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ছিল খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে ইউরেশীয়দের নিরাপত্তার প্রশ্ন। কিন্তু প্রথা পরিবর্তনশীল; মূল তত্ত্ব শাশ্বত। সহমরণ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত,

বিধবা বিবাহ প্রচলিত। এতে হিন্দুধর্মের কেশাগ্রও খণ্ডিত হয়নি। যথাবিহিত মন্ত্র উচ্চারণ করেই বিধবা বিবাহ হয়েছে এবং হচ্ছে।

ডিরোজিওর হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আবার জেণ্টুদের ধর্ম সম্বন্ধে অবজ্ঞা তাঁর সহজাত। মনে রাখতে হবে, যে বয়সে ডিরোজিও ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য আত্মস্থ করে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন এখন সেই বয়সের অধিকাংশ বঙ্গসন্তানই দু লাইন ইংরেজী বা বাংলা সঠিকভাবে লিখতে পারেনা। পিতামাতার চোখে আজকাল তারা নাবালক। দোষ দিতে হয় তাঁদের, যাঁরা বিজাতীয় মানসিকতার শিকার হয়ে ডিরোজিওকে যুক্তিবাদী, মুক্ত মনের মানুষ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন। ডিরোজিও যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন অসম্পূর্ণ ও বিকৃত তথ্যের উপর। বিকৃত তথ্য থেকে যুক্তি প্রয়োগে আহরিত 'সত্য'ও বিকৃত। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব শিষ্যই বুঝতে পেরেছিলেন গুরুর উপদেশের ভ্রান্তি। 'নিপাত যাওয়া' হিন্দুধর্মে তাঁরা ফিরে এসেছিলেন প্রায় সকলে।

ডিরোজিওর চিঠির দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা যায় না। সরাসরিভাবে পিতামাতার বিরুদ্ধাচারণ করতে ডিরোজিও নিশ্চয় বলেননি। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম না বললেও এসব ব্যাপারে খৃষ্টধর্মের নৈতিকতা উচ্চ। ডিরোজিও ছিলেন একজন সৎ খৃষ্টান। তিনি যিশু আদিষ্ট নৈতিকতা মেনে চলার চেষ্টা করতেন বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু তাঁর প্রবিষ্ট পৌত্তলিকতাবিদ্বেষই ছাত্রদের মনে পৌত্তলিক পিতামাতা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল।

[বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' বইতে ডিরোজিওর চিঠির সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে গিয়ে উদ্দেশ্য-পূর্ণ ভাবে স্বলিখিত কয়েকটি লাইন যোগ করেছেন। তার মধ্যে আছে, "পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার মুখোস পরে অমানুষ হওয়ার চেয়ে কিছুটা অবাধ্য হয়েও মানুষ হওয়া শ্রেয়।" এই ধরনের বক্তব্য ডিরোজিওর নৈতিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে]

উইলসনের তৃতীয় প্রশ্ন আজকালের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট অশ্লীল মনে হতে পারে। কিন্তু সময়টা তখন 1831 খৃষ্টাব্দ। সে সময়ে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের ঋতুদর্শনের আগেই বিয়ে হতে যেত। ভাইবোন বড় হলে তাদের বসবাসের মধ্যে দূরত্ব গড়ে উঠতো। আবার কৌলিন্য প্রথা, বাল-বিধবা ইত্যাদি জড়িত কারণে নানারকম ব্যভিচার প্রচলিত ছিল হিন্দুসমাজে। কিন্তু ইউরেশীয় পরিবারে প্রচলিত ছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। ডিরোজিও-ভবনে অনূঢ়া ভগিনী অ্যামেলিয়ার ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। সে বাড়ীতে বিলক্ষণ গতায়াত ছিল কিশোর ছাত্রদের। ভগিনীর সঙ্গে বড়ই স্নেহময় সম্পর্ক ছিল ডিরোজিওর। ভগিনী দাদার কাছে মাঝে মাঝে বৌদি আনার আবদার করতো।

তার উত্তরে ডিরোজিও লিখেছিলেন সুন্দর একটি কবিতা ঃ

বৌদিদি চাস ? বোনটি আমার,
বৌদিদি তোর চাই ?
তারার হাটে খুঁজবো এবার
দেখবো যদি পাই !
তুই যে মোদের পুণ্য প্রভা,
ঠাকুর ঘরের দীপ ;
তোর মতোটিই আনতে হবে
পুর্ণ হোমের টিপ্‌ ।
স্বপ্ন দেবীর পাখা দুখান
ধার করে না নিয়ে,
ঝড়ের রাতে বেরিয়ে যাব
কারেও না জানিয়ে ;
ধরবো গিয়ে ঝড়ের বেগে
রামধনুকের ডোর,
রামধনুকের একটি রেখা
বৌদি হবে তোর !
ডুববো সোজা সাগর জলে
সুর্যালোকের মত,
প্রবল গুহায় অপ্সরীরা
নাইতে যেথায় রত,
পরীরাণীর মুকুটখানি
আনবে সাথে মোর ;
সেই মুকুটের মধ্যমনি
বৌদি হবে তোর !
পক্ষীরাজের পিঠেতে সাজ
মুখে লাগাম দিয়ে,
জাদু জানা পাগল পানা
কল্পনাকে নিয়ে,
সটান গিয়ে কল্প লোকের
আনব সে মন্দার ।
বৌদি তোমার সেই তো হবে
বোনটি গো আমার ।[৪৩৪]

হিন্দু সমাজের কিছু মানুষ কুৎসা প্রচার করেছিল সত্য। এক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অন্য সমাজকে দেখলে এ ধরনের বিকৃতি আসা সম্ভব।

এই তৃতীয় প্রশ্নের ডিরোজিও যে উত্তর দিয়েছিলেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে বৃন্দাবন ঘোষালের রটনা আজকালকার যুগেও অস্বাভাবিক নয়। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক, অধ্যাপকের সুন্দরী ভগ্নী (বা কন্যা) থাকলে ঝড় জলের রাতেও টালা থেকে টালিগঞ্জ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়া। বা তাঁর বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া নেওয়া! নান্দনিক কারণেই।

আর সুপুরুষ ধনীর দুলাল দক্ষিণারঞ্জন যে 'লেডী কিলার' ছিলেন তাতো ঐতিহাসিক সত্য! উনি বর্দ্ধমানের বিধবা রাজমহিষীকে ইলোপ করে আনতে গিয়ে বেধড়ক প্রহার খেয়েছিলেন। মিস্ হাউদের ব্যাপারেও দক্ষিণারঞ্জনের যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, সেকথা শিবনাথ শাস্ত্রী লিখে গেছেন।

যাঁরা ডিরোজিওকে নাস্তিক অজ্ঞাবাদী বানাতে চান তাঁরা লক্ষ্য করবেন চিঠিতে দুবার দুটি বাক্যে ডিরোজিও নিজের আস্তিকতার কথা লিখেছেন। বিনয় ঘোষ দ্বিতীয় বাক্যটি সুকৌশলে বাদ দিয়ে চিঠিটি 'সম্পূর্ণ' উদ্ধৃত' করেছেন তাঁর 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' পুস্তকে! সত্য নিষ্ঠার চমৎকার উদাহরণ!

৫. উত্তর কথা

পদত্যাগ করলেন ডিরোজিও। তাতে বরং সুবিধাই হলো তাঁর। এখন আর ছাত্রদের কাছে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে বাধা নেই। আর ছাত্ররাও তো তাঁর হাতের কাছেই! তাছাড়া স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু কাজ করার সুযোগ এসে গেল তাঁর হাতে। স্ব-সম্প্রদায়ের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তিনি লড়াইও সুরু করে দিলেন। 1831 এর জুনে একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন সুরু করলেন জিরোজিও। নাম, 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান'। যদিও 'ক্যালিডোস্কোপের' মত স্বজাতিদের স্বার্থরক্ষা এবং হিন্দুদের নিপাত করাই 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের' উদ্দেশ্য, তবুও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হল, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' সমস্ত সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার নিয়ে লড়াই করবে।

শুধু ডিরোজিওই নয়, তাঁর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাঁর ছাত্ররাও একে একে পত্রিকা সম্পাদনা করতে সুরু করলেন। 1831 খৃষ্টাব্দের মে মাসে কৃষ্ণমোহন পত্তন করলেন এক ইংরেজী সাপ্তাহিক, 'এনকোয়ারার।' পরের মাসে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী পত্তন করলেন বাংলা সংবাদ-পত্র 'জ্ঞানান্বেষণের'। 'জ্ঞানান্বেষণ' পরে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হতো। উভয় পত্রিকার মাধ্যমেই ডিরোজিওর ছাত্ররা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। সমসাময়িক মিশনারী পত্রিকা 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভারের' মতে 'এনকোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দুদের এক ক্ষুদ্র দলের মুখপত্র, যাঁরা ইংরেজী সাহিত্যে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেছে এবং উদারনৈতিকতায় সবচেয়ে অগ্রসর। যাঁরা সর্বপ্রকার কপটতা ও দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার সঙ্গে লড়াই করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের সবকিছু—শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ, প্রাচীন এবং আধুনিক, বৈদান্তিক এবং পৌরাণিক, জলাঞ্জলি দিয়েছে। এসব করে তারা একটি ধর্মশূন্য অবস্থায় আছে এবং তারা নিজেদের সত্যসন্ধানী বলে ঘোষণা করেছে।"[5.1]

'এনকোয়ারারের' হিন্দুধর্মের ওপর যুক্তিহীন জেহাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে ইয়ং-বেঙ্গলের প্রতি সহানুভূতিশীল 'ইণ্ডিয়া গেজেট' লেখে, "দেখা যাচ্ছে সবকিছুই পরিকল্পিত ভাবে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করার জন্য; বিশ্বাস জন্মাবার জন্য কিছুই নেই। যা বোঝা যাচ্ছে, লেখকেরা বয়সে তরুণ ও অনভিজ্ঞ, তাঁদের ইংরেজীও কাঁচা, তাঁদের পিতৃপুরুষের ধর্ম সম্পর্কেও ভাসা ভাসা জ্ঞান—যাতে তাঁদের বিশ্বাস টলেছে, কিন্তু পরিবর্ত হিসাবে কোন কিছুকে তাঁরা স্থান দিতে

পারেন নি। দেশের লোকেরা তাঁদের এই রকম মনোভাব কিভাবে গণ্য করবে জানিনা, এবং অবশ্যই সিদ্ধান্ত করবো, এই মানসিকতা যতক্ষণ না তাঁরা ত্যাগ করছেন ততক্ষণ তাঁদের সত্য ও সৎগুণের পথে উপযোগী হওয়ার সমস্ত আকাঙ্খা ত্যাগ করতে হবে।[৫.২]

গোটা ব্যাপারটা বালসুলভ। ডিরোজিও প্ররোচিত ধর্মশূন্য অবস্থাটা বজায় থাকবে না, খৃষ্টধর্ম এসে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। এটাই ডিরোজিওর আকাঙ্খিত ছিল। অন্ততঃ দুজন শিষ্যর ক্ষেত্রে তা পূরণও হয়েছিল। পরবর্তী-কালে কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় বলেন, হিন্দুকলেজের শিক্ষার প্রভাবে প্রথমে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক হয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর মনে একটি মৌলিক ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ সঞ্চারিত করেন ডিরোজিও। ফলে নাস্তিকতা সত্বেও তিনি নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস ফিরে পেলেন। এরকম মানসিক অবস্থায় খৃষ্টধর্ম তাঁদের আশ্রয় দিল, এবং তিনি ধন্য হলেন।[৫.৩]

ডিরোজিওর দুই জীবনীকার এডওয়ার্ডস ও ম্যাজও কৃষ্ণমোহনের ও মহেশচন্দ্রের ধর্মান্তর গ্রহণে ডিরোজিওর অবদানের কথা বলেছেন।

[প্রতিবাদে কেউ হয়তো বলতে পারেন, "কেন কৃষ্ণমোহন ও তাঁর বন্ধুরা তো কলকাতার পথে পথে যিশুর বাণী প্রচারের ভান করে মিশনারীদের বিকৃত বাংলা ভাষা ও ভুল উচ্চারণ নকল করে তাঁদের প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতেন?" চিন্তা করে দেখলে এটা স্পষ্টতই অনুভূত হবে, এই বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধার লক্ষ্য খৃষ্ট বা খৃষ্টধর্ম নয়, অযোগ্য সুসমাচার প্রচারকের দল। খৃষ্টধর্মের কোনও তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি কৃষ্ণমোহনরা]

'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের' পাতাতে ডিরোজিও শুধু যে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে মুখের ফেনা বের করতে লাগলেন তাই নয়, রামমোহনের মত সংস্কার-পন্থী ও প্রসন্ন কুমারের মত মধ্যপন্থী হিন্দুদেরও রেহাই দিলেন না। তাঁর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মাধবচন্দ্র মল্লিক 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানে' লিখলেন, "রামমোহন রায় যে কিসে বিশ্বাস করেন আর কিসে বিশ্বাস করেন না, তা তাঁর শত্রুমিত্র কেউই জানেন না। এতো সর্বজনবিদিত যে রামমোহন বেদ, পুরাণ, কোরান, বাইবেল, সবকিছুর কাছেই আবেদন রাখেন, প্রত্যেকটার ভালটা আহরণ করেন, আর কোনও কিছু খারাপ লাগলেই বাতিল করে দেন। তিনি যোগ দেন খৃষ্টান এবং হিন্দু উভয় একেশ্বরবাদীদের প্রার্থনায়। যদিও কোনটাকে তিনি বেশী পছন্দ করেন, তা বলা শক্ত। মানুষের কাছে ব্রাহ্মণসুলভ প্রণাম পেলে তিনি ব্রাহ্মণসুলভ আশীর্বানীও করেন এবং ব্রাহ্মসভার কার্যপদ্ধতি যদি তাঁর অনুমোদিত বলে ধরা যায়, তাহলে তাতে দেখা যায়, গোঁড়া হিন্দুদের মত

তাঁরা ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি সর্বদা হিন্দুদের মত জীবন যাপন করেন; শীতকালে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প মদ্য পানও করেন। ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে খাবার টেবিলেও বসেন তিনি, যদিও কিছুই খাননা। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজনের আচার আচরণ মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর নামের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে মদ মাংসে ডুব দেন আবার ব্রাহ্মণদের প্রণামী দিতেও ভোলেন না। মুখে হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসের কথা বললেও ব্রাহ্মণদের প্রণামী দিতে ও বাড়ীতে পুজা করতে ছাড়েন না।"[5.4]

এখানে অনুধাবন যোগ্য রামমোহন ছিলেন একজন সংস্কারবাদী হিন্দু। কিন্তু ডিরোজিও শিষ্যরা হিন্দুত্বকে আপাদমস্তক বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন ডিরোজিওর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে। সুতরাং রামমোহন রায় পৌত্তলিকতাবিরোধী হয়েও কেন হিন্দু আচার ত্যাগ করছেন না, এটাই ছিল তাদের মাথাব্যথার কারণ। সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের কোনও বোধই ছিল না। উচ্চস্তরের হিন্দু সাধকেরা যে পরব্রহ্মবাদী হতে পারে—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিমিরাচ্ছন্ন এইসব বিভ্রান্ত বালখিল্যদের তা ছিল ধারণার অতীত। কিন্তু রামমোহনের কাছে বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, আবেস্তা ইত্যাদি পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ ছিল জলবৎ তরলং। রামমোহন প্রতিভার বিশাল বর্ণালীকে উপলব্ধি করার সামর্থ বিভ্রান্ত বালখিল্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাই তাদের এ হেন অভিযোগ। তাঁদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ, রামমোহন কেন হিন্দুদের মত চলাফেরা করেন। অর্থাৎ রামমোহন তাঁদের মত গোমাংসভক্ষণ করেন না দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না।

এছাড়া দেখা যাচ্ছে ডিরোজিও-শিষ্যরা এক ধরনের বৌদ্ধিক ফ্যাসীবাদে বিশ্বাসী। একজন পৌত্তলিকতা-বিরোধী হলেই তাঁর পরিবারের সকলের ওপর মানসিকতাটি চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের পুজোপাট বন্ধ করতে হবে। মানসিকভাবে পরিবারের লোকজনেরা নাস্তিকতা বা একেশ্বরবাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হোন বা না হোন, সেটা দেখার প্রয়োজন নেই! কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাড়ীর কর্তাই সব। তাই তাঁরা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সম্পর্কে অনুযোগ করেন, প্রসন্ন কুমার নিজেকে একেশ্বরবাদী বললেও বাড়ীতে দুর্গাপুজো করেন। ডিরোজিও শিষ্যগণ আশা করতেন প্রসন্ন কুমারের মত মানুষেরা আত্মীয়-স্বজনদেরও বলপ্রয়োগ করে একেশ্বরবাদী করবেন; পুজোপাট সবকিছুই বন্ধ করে দেবেন বাড়ীতে। প্রসন্ন কুমারের অনুরাগীরা অবশ্য সাফাই গেয়েছিলেন যে, পুজোপাট বন্ধ করে দিলে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন প্রসন্ন কুমার। আসলে

খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে হিন্দু একেশ্বরবাদের আশ্রয়ে ভিড় করেছিলেন শিক্ষিত পৌত্তলিক হিন্দুরা। কিন্তু হিন্দু একেশ্বরবাদ সহজে অনুধাবনযোগ্য নয়; "এক ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারও আরাধনা করিবে না" বললেই সকলে ব্রহ্মবাদী হতে পারেন না। এটা কোনও রাজনৈতিক স্লোগান নয়। শুধু হিন্দু কেন, কোনও একেশ্বরবাদই সহজ অনুধাবনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে পৌত্তলিকতা মানুষের সহজাত ধর্ম, সর্বত্রব্যাপী সহজগ্রাহ্য ও লোককান্ত। রামমোহন একেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন সেমীয় একেশ্বরবাদের তাড়নাতেই। সুপ্রাচীন ও বিবর্তনমুখী হিন্দুধর্মকে তিনি যথার্থ সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই শিক্ষিত সমাজের বাইরে রামমোহনের ধর্মসংস্কারের কোনও প্রভাব ছিল না। রামমোহন প্রোথিত ব্রাহ্মধর্মও কোনওদিন ব্যাপক বিস্তারলাভ করে নি। জনগণনার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও ব্রাহ্মদের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ হাজার মাত্র। সুতরাং একেশ্বরবাদ তখন অনেক শিক্ষিত মানুষের কাছেই ছিল আত্মরক্ষার পরিচ্ছদ মাত্র। তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে তা প্রবিষ্ট হতে পারে নি। সেইজন্য তাঁরা এক কথায় বর্জন করতে পারেননি যাবতীয় পুরানো রীতিপ্রথা। অবশ্য তৎকালীন বঙ্গসমাজে যথার্থ ভণ্ডলোকের অভাব ছিল না। মদ্যমাংসের লোভেই অনেকে আধুনিক সাজতেন!

মাধবচন্দ্রের প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষও লক্ষণীয়। এ ব্রাহ্মণ বিদ্বেষও ডিরোজিও সূত্রে প্রাপ্ত। ডিরোজিও ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মত বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রাহ্মণরাই হিন্দু সমাজের দুর্গরক্ষক। তাঁরা থাকার জন্যই ভারতীয়দের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ মুছে খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের প্রসারণ ঘটানো যাচ্ছে না। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ সবচেয়ে প্রকটরূপে দেখা যায় কৃষ্ণমোহনের মধ্যে। কৃষ্ণমোহন বলেন[5.5] "ব্রহ্মণ্যবাদ দেশের মধ্যে প্রোথিত দুর্নীতি বৃক্ষ। হিন্দুদের যদি কেউ উপকার করতে চায় তাহলে তাকে এই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। এই বৃক্ষ কোনওদিনই সুফল প্রসব করবে না।" কৃষ্ণমোহনের এই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের পাশাপাশি যেমন ফ্রান্সিস জেভিয়ারে ব্রাহ্মণবিরোধী উক্তি রাখা যায় তেমনই রাখা যায় সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের উক্তিঃ

"যদি কাফের ও মুশরিক হিন্দুদিগের সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করা না যায়, তাহা হইলেও এতটুকু করিতে হইবে, যাহাতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলের এই সকল জঘন্য শত্রু অসম্মান ও অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হয়। বাদশাহদের ধর্মভীরুতার লক্ষণ এই যে, যখনই তাঁহাদের দৃষ্টি এই হিন্দুদের ওপর পড়িবে, তখনই ক্রোধে মুখমণ্ডল অগ্নিবর্ণ ধারণ করিবে এবং ইহাদিগকে

জিন্দা গোর দিবার কথা বারংবার মনে উদয় হইবে। বিশেষ করিয়া এই সকল কাফেরের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। কারণ, ইহাদের দ্বারাই অধর্মের ও কুফরীর প্রসারলাভ ঘটিয়া থাকে।"[১.৬]

দেখা যাচ্ছে, মানসিকতার দিক দিয়ে কৃষ্ণমোহন, ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও গিয়াসউদ্দিন বলবন একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে।

এর পরের ঘটনা হলো 1831 খৃষ্টাব্দের জুলাই এর। ওই মাসের গোড়ার দিকে ইউরেশীয় নেতা জন রিকেটসকে টাউন হলে এক বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হলো। ব্যাপারটা ইউরেশীয়দের নিজস্ব। এর মধ্যে ভারতীয় হিন্দুমুসলমান-দের কোনও স্বার্থ নেই। তবুও এই সময় বহু ভারতীয় নিমন্ত্রিত হলেন। তারমধ্যে কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকও। তখন তাঁরা শিক্ষা সম্পন্ন করে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক। দুজনেই ঠিক করলেন সভাতে তো যোগদান করবেনই, নৈশ ভোজেও ইউরেশীয়দের সঙ্গে গোমাংস ভক্ষণ করবেন। কারণ, তাদের তো কোনও কুসংস্কার নেই!

শিক্ষকদের দৃষ্টান্তে ছাত্রদেরও গোমাংসে অনুপ্রাণিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং হিন্দুসমাজকে বাধা দিতে হয়। বাধা দিলেন স্কুল সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক রাধাকান্ত দেব। হেয়ারের বিশেষ অনুরোধে ডিরোজিও শিষ্যদ্বয় ভোজসভায় আর আহার সারতে পারেননি।

1831 খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডিরোজিও শিষ্যরা বাঁধালেন এক মহাকেলেঙ্কারী—যা ডিরোজিওর শিক্ষারই যুক্তিসঙ্গত পরিণাম বলা যায়। কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ী ছিল ঠনঠনিয়ার গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। 23শে আগষ্ট রাতে কৃষ্ণমোহন কোনও কাজের জন্য বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্ধুবান্ধবেরা দল বেঁধে তাঁর বাড়ীতে এসে হিন্দুদের আদ্য-শ্রাদ্ধ করছিলেন। গরম গরম কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে তাঁরা মেছুয়াবাজার থেকে রুটি ও গোমাংস কিনে এনে ভক্ষণ করতে লেগে গেলেন। কারণ গোমাংস ভক্ষণ ছাড়া যে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না, সেটা তো সেমীয় একেশ্বরবাদীরা তাঁদের কানে ভালভাবেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শুধু গোমাংস ভক্ষণেই বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না। হিন্দুত্বকে যথাযথ আঘাত হানতে তাঁরা উচ্ছিষ্ট মাংস ও হাড় প্রতিবেশী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শম্ভুচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহে ছুঁড়ে দিয়ে 'ঐ গোমাংস! ঐ গোহাড়' বলে চিৎকার সুরু করলেন।

চিৎকার শুনে চক্রবর্তীরা বেরিয়ে এসে "ডিরোজিও বৃক্ষের ফলদের" কাণ্ড-কারখানা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। লোকজন ডেকে ধাওয়া করলেন বিপ্লবীদের দিকে। প্রহারের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে দৌড় দিলেন ডিরোজিও-শিষ্যগণ। কৃষ্ণ-

মোহনের দাদা ভুবনমোহন বাড়ী ফেরা মাত্র প্রতিবেশীরা দাবী করলেন, কৃষ্ণমোহনকে বাড়ী ছাড়া করতে হবে। শেষপর্যন্ত তাই করা হলো। কৃষ্ণমোহনকে ত্যাগ করতে হলো পিতৃগৃহ। হিন্দুপাড়ায় কেউ তাঁকে ঘর ভাড়াও দিতে চাইলো না। উপরন্তু গোমাংসভোজীকে গালাগাল ও কটুকথা বর্ষণ করতে লাগলো। শেষপর্যন্ত কৃষ্ণমোহনকে আশ্রয় দিলেন বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন। মাঝে তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেও আবার ফিরে এসেছেন বাড়ীতে।

এদিকে সুযোগ বুঝে গৃহ-তাড়িত কৃষ্ণমোহনের দিকে এগিয়ে গেলেন সুদক্ষ শিকারী অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ। একজন মধ্যবর্তী বন্ধুর সহায়তায় কৃষ্ণমোহনের পরিচিত হয়ে, তাঁর তৎকালীন অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে খৃষ্টীয় সত্য না জানার জন্য অনুযোগ করলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে এবং ডাফের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর বাড়ীতে খৃষ্টীয় উপদেশ মালায় অংশ গ্রহণ করতে রাজী হলেন। ফলে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কিত দ্বিতীয় বক্তৃতামালার সুরু হলো।

আবার ডাফের প্ররোচনাতে কৃষ্ণমোহন মন্ত্রণা দিতে লাগলেন দক্ষিণারঞ্জনের কানে। ফলে জনরব উঠলো যে দুই বন্ধু অচিরেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করছেন। "একদিন দক্ষিণারঞ্জন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জনের নিষ্ঠাবান পিতা পূজা আহ্নিকাদি সমাপনান্তে বহির্বাটীতে আসছেন, এমন সময় এই অমূলক রটনা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ঠ হলো। তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হলেন এবং পাদদেশ থেকে কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা উন্মোচন করে কৃষ্ণমোহনের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং অবিলম্বে তাঁকে গৃহ পরিত্যাগ করতে আদেশ করলেন।"[5.7]

দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃষ্ণমোহন ধর্মতলা অঞ্চলে খৃষ্টানদের সঙ্গেই বসবাস করতে থাকেন। এই সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা হয়। কর্ণেল পাউীন নামক এক খৃষ্টভক্ত কর্নেলের সঙ্গে তিনি ষ্টীমারযোগে গঙ্গাসাগরও ভ্রমণ করেন বলে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন।[5.8]

গোহাড় নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে কৃষ্ণমোহনদের প্রতি সহানুভূতিশীল পত্রিকা 'দি বেঙ্গল ক্রনিকল' মন্তব্য করে," দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা বিবেচনা বা ক্ষমা করাও দুরূহ"।[5.9]

শুধু অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ নন, ওই সময়ে বেকার হিন্দুদ্রোহী ডিরোজিও শিষ্যদের দুরবস্থার সুযোগ নিতে অনেকেই তৎপর ছিলেন। সালাহ্উদ্দিন আহমদ বেণ্টিক পেপার্স ঘেঁটে দেখিয়েছেন, ওই সময়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ানও বেকার ডিরোজিও-শিষ্যদের চাকরী দেওয়ার জন্য

গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংককে সুপারিশ করেন। কারণ, "এইসব চাকরী প্রাপ্ত ডিরোজিয়ানরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের দুর্গ ভাঙ্গতে সক্ষম হবে।"[5.10]

গোহাড় নিক্ষেপের ফলস্বরূপই শেষপর্যন্ত কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের চাকরী যায় পটলডাঙ্গা স্কুল থেকে। রাধাকান্ত দেব 1831 খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর হেয়ারকে লিখেছেন,[5.11] "আপনি নিশ্চয় পটলডাঙ্গা স্কুলের দুই শিক্ষকের নৈশভোজের কথা শুনেছেন। আমি জানতে চাইছি, আপনি জাতিচ্যুতদের স্কুল থেকে তাড়াবেন, না তাদের স্কুলে রেখে হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করবেন ?" নৈশভোজ আগে ঘটলেও গোহাড় নিক্ষেপের পরে রাধাকান্তর চাপে কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণের চাকরী গেল। এঁদের কার্যদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্তর অভিযোগ নস্যাৎ করতে পারলেন না ডেভিড হেয়ার।

গৃহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় কৃষ্ণমোহন একটি নাটকও লিখে ফেললেন। নাম, 'দি পারসিকিউটেড'। তাতে ওই গোমাংসভক্ষণও তৎপরবর্তী ঘটনার প্রকাশ। হিন্দুধর্ম ও তৎকালীন হিন্দুসমাজকে আক্রমণ।

নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আহারের জন্য মহাদেব পুত্র বেনীলালকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বললেন। ছেলের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কিন্তু তিনি ছেলেকে অনুরোধ করলেন, জাতপাত যেন বজায় থাকে। বেনীলাল নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীতহলো, বৃদ্ধ পিতার জন্যও সত্যকে বর্জন করা যায় না। বালখিল্য কৃষ্ণমোহনের ধারণা, গোমাংস ভক্ষণই জীবনের চরমতম সত্য ! ধন্য ডিরোজিওর শিক্ষা-মহিমা !

গুরু ডিরোজিওর 'সত্য' সম্পর্কে কোনও উন্নততর বোধ ছিল না। ডিরোজিও 'সত্য'কে দেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলেছিলেন, "এমনকি দেশের প্রতি ভালোবাসাও আমাকে সত্যকথন থেকে বিরত করতে পারবে না।" কিন্তু কোন্ 'সত্য' ? সত্য হচ্ছে ঐহিক আত্মোন্নতি। কথাটা বলেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ

"আমার এক ভাই আছে স্কটল্যাণ্ডে, সেখানে সে একটি পেশা নিয়ে অধ্যয়ন করছে, যেটা এখানে পড়া সম্ভব নয়। তাকে এখানে আটকে রেখে ভবিষ্যতে "তুমি জীবনে অনেক বড় কিছু হতে পারতে, কিন্তু দেশপ্রেমের মানসিকতা নিয়ে তুমি এখানেই লেখাপড়া শিখেছো" বলাটা কি অবিচার হতো না ?"

পরে দেখা গেছে ডিরোজিওরা এই "বড় হবার" তাগিদেই দলে দলে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন অন্যত্র।[5.12]

ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে নাটকে কৃষ্ণমোহন লিখলেন পৌরহিত্য বৃত্তির তাগিদে

তাঁরা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখেন না…শুধু স্বার্থপরতাই ব্রাহ্মণদের পরিচয় নয়, বর্বরতা ও অমানবিকতা ব্রাহ্মণদের অপরাপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গৃহচ্যুত কৃষ্ণমোহনকে বোধ হয় ক্ষমা করে দেওয়া যায় 'দি পারসিকিউটেড' নাটক লেখার অপরাধ থেকে। প্রতিভাবান এই বঙ্গসন্তান তখন নিতান্তই পরিস্থিতির শিকার। ডাফ-ডিরোজিওর দ্বারা বিভ্রান্ত। বন্ধু-বান্ধবদের সাময়িক অত্যুৎসাহের জন্যই বিড়ম্বিত হয়েছিল তাঁর জীবন!

হিন্দুধর্ম নিন্দায় সবচেয়ে এগিয়ে গেলেন অবশ্য মাধবচন্দ্র মল্লিক। তিনি বললেন…"পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্ররা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমাদের অপর কোনও ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম কুকর্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্মে যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয় আমরা বুঝি না।"[5.13]

যাইহোক ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের হিন্দুধর্ম বিরোধী ধারাবাহিক কুৎসা প্রচার তাঁদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেটেও' সমর্থন করতে পারেনি। 21শে অক্টোবর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট' লিখেছে, "বাঙ্গালী তরুণেরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেশীয় সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণ করছে।"

তারপর প্রায় আকস্মিক ভাবেই জীবনাবসান ঘটলো ডিরোজিওর। 1831 খৃষ্টাব্দের 17ই ডিসেম্বর কর্মোদ্যোগী ডিরোজিও গিয়েছিলেন তাঁর পুরনো স্কুল 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমীর' পরীক্ষা নিতে। পরীক্ষা নিয়ে এসে সুন্দর একটি প্রতিবেদনও লিখলেন 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের' জন্য। সেই প্রতিবেদনে দেখা গেল স্ব-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের জন্য তিনি চিন্তিত। সঙ্গে সেই অপ্রতিহত হিন্দুবিদ্বেষ। লিখলেন ঃ

"একজন হিন্দু তার ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করলে দেশবাসীরা তাকে জাতিচ্যুত বলেন। তিনি এখন আর হিন্দু নন। তবে কি তিনি? তিনি উত্তর দেন, একজন সত্যপ্রেমী।"[5.14]

একজন খৃষ্টান তাঁর খৃষ্টীয় আচার আচরণ পরিত্যাগ করলে সত্যপ্রেমী হন না মিথ্যাপ্রেমী হন, সে বিষয়ে ডিরোজিও কিছু লেখেন নি!

তারপরই তিনি আক্রান্ত হলেন মারাত্মক কলেরা রোগে। তখনকার দিনে কলেরা রোগে মৃত্যু প্রায় অবধারিত ছিল। সেজন্য 23শে ডিসেম্বর তিনি একটি উইল করলেন। তাতে সমস্ত সম্পত্তি সমভাবে ছোট ভাই ও ছোট বোনের মধ্যে ভাগ করে

দিলেন। অন্তিমকালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ডঃ জন গ্র্যান্ট, ইউরেশীয় নেতা রিকেটস প্রমুখ ছাত্র ও বন্ধুরা উপস্থিত থাকতেন। টমাস এডওয়ার্ডসের বর্ণনাঅনুযায়ী ডিরোজিওর জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁকে স্কচ কবি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা টমাস ক্যাম্পবেলের বিখ্যাত কবিতা 'প্লেজারস অব হোপ' থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছিল। রিকেটস ফাদার হিলকে ডেকে এনেছিলেন 'কনফেশানের' জন্য।

26শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটায় অবসান ঘটলো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিওর জীবনের। যথারীতি পার্ক স্ট্রীটের খৃষ্টীয় কবরখানায় সমাহিত হলো তাঁর দেহ।

আধুনিক সেকুলার লেখকগণ ডিরোজিওকে নাস্তিক বলে অভিক্ষেপ করেন। প্রচার করেন, "খৃষ্টধর্মের নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁর ঈশ্বর মাহাত্ম্য বা অলৌকিকতাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।" প্রচার করেন, পাদ্রী হিলকে নাকি তিনি মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন, "ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কী তা আজও আমি জানি না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়নি এখনও।"

এ ধরনের অপ্রামানিক উক্তির সূত্র সম্ভবতঃ টমাস এডওয়ার্ডসের ডিরোজিও জীবনী। এডওয়ার্ডস লিখেছেন ঃ

Mahesh Chunder Ghosh was present when the Rev. Mr Hill visited Derozio and heard all that passed between them, unless what may have been said in a few whispered words ; but he himself afterwards became a Christian and no reason for withholding the truth, he decleared no death-bed, recantation, no document signed by Derozio—declaring his belief in Chrstianity but that Derozio died, as he had lived,searching for truth.

[রেভারেন্ড হিল যখন ডিরোজিওকে দর্শন করেন তখন মহেশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্ত কথাবার্তাই শুনেছিলেন, কানে কানে কিছু কথাবার্তা ছাড়া। যদিও তিনি পরে খৃষ্টান হয়েছিলেন এবং সত্য গোপন করার কোনও কারণই নেই তাঁর, তিনি ঘোষণা করেন, কোনও রকম মৃত্যুকালীন ত্রুটি স্বীকার ছিল না, খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে কোনও দলিলও স্বাক্ষর করেননি ডিরোজিও। ডিরোজিও যেমনভাবে জীবন যাপন করতেন তেমন ভাবেই মরেছিলেন, সত্য অনুসন্ধান করতে করতে]

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মহেশচন্দ্রের মুখের কথা বিকৃত হয়ে চলে এসেছে ডিরোজিওর মুখে।

মহেশচন্দ্র ঘোষের উক্তির উৎস এডওয়ার্ডস আমাদের জানান নি। এডওয়ার্ডসের বই লেখার বহু আগে তিরিশের দশকেই মহেশচন্দ্র প্রয়াত হন। সুরেশ চন্দ্র মৈত্র [5.15] বলেছেন "সেই খৃষ্টান মহেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন…কিন্তু কোথায় লিখেছেন সেকথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এ সমস্ত তথ্যই অপ্রামানিক। কল্পিত !

এডওয়ার্ড কিছু পরে আবার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, Derozio lived in the faith and spirit of Christ as he understood that faith and life and in no other faith could he live or die.

[ডিরোজিও খৃষ্টের চেতনা ও বিশ্বাসের মধ্যেই জীবন যাপন করতেন— সেই বিশ্বাস ও জীবন তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন, এবং অন্য কোনও বিশ্বাসে তিনি মরতে বা জীবন যাপন করতে পারতেন না।]

এছাড়া মহেশচন্দ্রের উক্তি সত্য হতে পারে না। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে পাদ্রীর কাছে খৃষ্টান বলে স্বীকার না করলে খৃষ্টীয় কবরস্থান কিছুতেই জুটতো না ডিরোজিওর মরদেহের। জোটেনি ডেভিড হেয়ারের বা ডিরোজিওর বাল্য-বন্ধু চার্লস পোটের। মহেশচন্দ্রের মিথ্যা বলার যুক্তি আছে—ডিরোজিওর মৃত্যুর সময় তো মহেশচন্দ্র খৃষ্টান ছিলেন না। গুরুকে নাস্তিক বলে অভিক্ষেপ করায় তাঁর স্বার্থ ছিল। কারণ, নিজেরা পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছেন আর গুরু নিজেকে খৃষ্টান বলে স্বীকার করছেন, এ বড় অসঙ্গতির ব্যাপার !

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডিরোজিও-শিষ্যরা অভিভাবক শূন্য হয়ে গেলেন না। প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠলেন চোরা শিকারী অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ।

এছাড়া ডিরোজিও শিষ্যদের মন কাড়লেন যথার্থ নাস্তিক ডেভিড হেয়ার। ডেভিড হেয়ারের প্রতি ডিরোজিও শিষ্যদের ভক্তি অবশ্য নতুন নয়। ভক্তির কারণও যথেষ্ট ছিল। হিন্দু ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্যেই তো নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হেয়ার; রামতনু লাহিড়ীর মত গরীব ছাত্ররা তো হেয়ারের বদান্যতাতেই লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের অল্প বয়স্ক ছাত্রদের বড়ই স্নেহ করতেন হেয়ার। হেয়ারের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, স্নেহশীল ব্যবহার আর নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা ছাত্রদের বিমোহিত করেছিল। তাঁরা ডেভিড হেয়ারকে সম্বর্ধনা জানাতে মনস্থ করেন। সেই অনুযায়ী 1830 খৃষ্টাব্দের 28 শে নভেম্বর তাঁরা ডেভিড হেয়ারকে প্রথম সংবর্ধনা জানান। সভাপতিত্ব

করেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সভা আহূত হয় 1831 খৃষ্টাব্দের 30 শে জানুয়ারীতে। সে সভার সভাপতি রসিক কৃষ্ণ মল্লিক। ওই সভাতে স্থির হয়, চাঁদা করে ডেভিড হেয়ারের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হবে। 1831 খৃষ্টাব্দের 17ই ফেব্রুয়ারী ডেভিড হেয়ারের জন্মদিনে দক্ষিণারঞ্জনের সভাপতিত্বে অসংখ্য ছাত্র সম্মিলিত হয় তাঁকে একটি প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য ডিরোজিওর বন্ধু বিখ্যাত ইউরেশীয়ান চিত্রকর চার্লস পোটের সামনে বসতেও অনুরোধ জানান হয়। দক্ষিণারঞ্জন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অভিনন্দনপত্র পাঠ করে সংবর্ধনার উত্তরে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার জানান ঃ এদেশে এসে দেখলাম যে এখানে নানারকম দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে। ভূমি উৎপাদিকা ও অর্থকরী শক্তি অক্ষয়। অধিবাসীরাও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকেদের মত ক্ষমতাবান। কিন্তু বহুকাল ধরে কুশাসন ও প্রজাপীড়নের জন্য এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হয়েছে। এদেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রচার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে বীজ আমার দ্বারা উপ্ত হয়েছে তা এখন মহীরুহ হয়ে উৎকৃষ্ট ফল দিচ্ছে—তার সাক্ষী তো আমার চতুর্দিকে প্রকাশিত।

সেই ডেভিড হেয়ার এগিয়ে এলেন ডিরোজিও-শিষ্যদের দিকে। ছাত্রদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে স্যার এডওয়ার্ড রায়ানকে বললেন তাদের জন্য সরকারী চাকুরীর বন্দোবস্ত করতে।

এদিকে ডিরোজিও-শিষ্যরা রামমোহন পন্থীদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হচ্ছে দেখে শঙ্কিত হলেন 'ইন্ডিয়া গেজেটের' মত সংবাদপত্রও। তাঁরা দেখলেন রামমোহন পন্থীরা মধ্যবয়সী, শিক্ষিত, ধনবান ও সামাজিক সম্মানের অধিকারী। তাঁরা পশ্চিমী ধ্যান-ধারণা ও চিরাচরিত হিন্দুধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সচেষ্ট। সুতরাং সংবাদপত্রগুলি ডিরোজিও শিষ্যদের পরামর্শ দিল মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য। কারণ ডিরোজিও শিষ্যদের কোনও সদর্থক দর্শন নেই। তাঁরা পিতৃপুরুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, ডিরোজিওর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে নাশকতায় লিপ্ত। মধ্যপন্থীদের সাহায্য নিলেই ডিরোজিও-শিষ্যরা তাঁদের অভীষ্ট ব্রত পালনে সমর্থ হবে।

এদিকে মৌলবাদী ডাফের প্রয়াস সফল হতে সুরু করলো। 1832 খৃষ্টাব্দের 28শে আগষ্ট কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই খবরে কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়ারারে' লিখলেন, "ভবিষ্যতে ডাফ আরও সুফল পাবেন।" হলোও তাই 1832 খৃষ্টাব্দের 17ই অক্টোবর স্বয়ং কৃষ্ণমোহন ধর্মান্তরিত হলেন ডাফের দ্বারা। ডেভিড হেয়ার তাঁকে এক কুসংস্কারের বদলে আর এক

কুসংস্কার গ্রহণ করতে নিষেধ করলেও বিরত হলেন না কৃষ্ণমোহন। উপরন্তু নিজে খৃষ্টান হয়ে অপরকে প্ররোচিত করতে লাগলেন খৃষ্টান হওয়ার জন্য। 14ই ডিসেম্বর ডাফ ধর্মান্তরিত করলেন গোপীনাথ নন্দীকে। ভয়, প্রলোভন ইত্যাদি দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়। তাঁকে বলা হয় অসুস্থ মায়ের কথা। গোপীনাথ মায়ের কথা শুনে অশ্রু বিসর্জন করলেও সংকল্পে অটল থাকেন। একের পর এক তরুণকে ধর্মান্তরিত হতে দেখে কৃষ্ণমোহন 'এনকোয়ারারে' লিখলেন,[5.16] "যেভাবে একের পর এক হিন্দু ধর্মান্তরিত হচ্ছে তার থেকে আমরা আশা করতে পারি সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যখনই দেশের সমস্ত মানুষই খৃষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে যাবে।" ডিরোজিও বৃক্ষের যথার্থ ফলই বটে কৃষ্ণমোহন!

এরকম পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও নতুন নতুন বিধি প্রবর্তিত হতে লাগলো। 1813 খৃষ্টাব্দের সনদ অনুযায়ী কোম্পানী ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী অনুদান দিতেন। ফলে কলকাতা, বারাণসী ও দিল্লীতে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার জন্য কলেজ গড়ে উঠেছিল। ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ সরকারের নীতির সমালোচনা করে বললেন, প্রাচ্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা অর্থহীন, সরকার প্রাচ্য বিদ্যার জন্য টাকা ঢালতে বাধ্য নয়।[5.17]

এরপর গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রণা পরিষদে যোগ দিয়ে কলকাতায় এলেন টমাস বাবিংটন মেকলে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সাথে পরামর্শ করে তিনি এক শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন যাতে শুধুমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যই সরকারী অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা রইলো। মেকলে প্রাচ্য ভাষাগুলিকে অবজ্ঞা করে বললেন, যদিও আমি সংস্কৃত ও আরবী পুস্তকসমূহ ইংরেজী ভাষাতেই পড়েছি, তাহলেও বলতে পারি, এক সেলফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তা নেই।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন "বলা বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু কলেজ থেকে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্বান্তকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহাই নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া তুলিলেন, বলিতে লাগিলেন যে এক সেলফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে সমগ্র ভারতবর্ষ ও আরবের সাহিত্যে তাহা নাই।[5.18]

মেকলের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিন্দা করা যায় না। কারণ, তিনি নিজে ইংরেজ, তায় সর্বশ্রেণীর হিন্দুরাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যগ্র

ছিলেন সে সময়। কিন্তু নিন্দা করতে হয় প্রাচ্য ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও তাঁর দম্ভোক্তিকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ডিরোজিও-শিষ্যগণও মোহগ্রস্ত হয়ে তাঁর দম্ভোক্তিকে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন!

এই মেকলেবাদই ডিরোজিও-শিষ্যদের অবশিষ্ট দেশবাসীদের থেকে পৃথক করে ফেলেছিল। তাঁরা মাতৃভাষা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন (ব্যতিক্রম অবশ্য প্যারিচাঁদ মিত্র)। রামগোপাল ঘোষ সন্ন্যাসী শব্দের বানান লিখতেন 'স্বন্যাসী।' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করলেও 'সংবাদ তিমির নাশকের' ভাষ্য অনুযায়ী "বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না, এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভালো পারেন না, তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয়।"[5.19]

একে তো ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সরকারী পক্ষপাতিত্ব, তাতে আবার ডিরোজিও শিষ্যদের উল্লাস। আবার ডাফের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের ক্লাশ। গোটা ব্যাপারটা সন্দিগ্ধ করে তুললো হিন্দুসমাজকে। এদিকে ডাফের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন মিশনারীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। 1835 খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জেভিয়ার্স ও 1836 খৃষ্টাব্দে ডিভোতা কলেজের ফাদাররা এবং 1841 এ লরেটো হাউসের নানরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের জন্যে। ফলে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিরাগ জন্মালো হিন্দু সমাজপতিদের। বিঘ্নিত হলো ইংরেজী শিক্ষার প্রসার।

কিন্তু ডিরোজিও আর ডাফই সব নয়। হিন্দু কলেজের সব ছাত্রই সমানভাবে ডিরোজিও গ্রস্ত নয়। সুতরাং কিছু অন্য সুরও শোনা গেল। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা ভারতে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপন করে একই সঙ্গে বৃটীশ ও খৃষ্টীয় রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 12. 12. 1830 এর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের' সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র একটি প্রবন্ধ লিখে ইংরেজদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের বিরোধিতা করলেন।[5.20] মহেশচন্দ্র কৃষ্ণমোহন ও গোপীনাথের খৃষ্টধর্ম গ্রহণও সব ছাত্র ভাল মনে নিতে পারলেন না। আস্তে আস্তে তাঁরা বুঝলেন, ধর্মের ব্যাপারে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে নতুন সরকারী নীতির ফলে অনেক ডিরোজিও শিষ্যই বড় বড় সরকারী চাকরী পেলেন। সরকারী চাকরীর অবসরে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করার জন্য 1838 খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাধারণ জ্ঞানার্জিকা সভা'। এই সভার নিয়মাবলীতে তাঁরা জানালেন, ধর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা সভাতে হবেনা।[5.21] শুধু তাই নয়, এখন দেখা গেল তাঁরা নিজেদের শিকড়

খ‍ুঁজতে সুরু করেছেন। তাঁরা হিন্দুস্থানের ইতিহাস চর্চা করছেন।[5.22] মাতৃভাষার চর্চার কথা বলছেন[5.23] প্যারীচাঁদ মিত্র বিনয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত হিন্দুসমাজের কুৎসা গাওয়ার জবাব দিচ্ছেন তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে।[5.24] চিন্তা করা যায়!

আবার দেখা গেল ডিরোজিও শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক 1835 খৃষ্টাব্দের 5ই জানুয়ারী টাউন হলে এক বিরাট সমাবেশে 1833 খৃষ্টাব্দের সনদের সমালোচনা করছেন এই বলে যে এতে শিক্ষাখাতে অর্থব্যয়ের পরিবর্তে অতিরিক্ত দুজন পাদ্রীর সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতবাসীর অর্থে।

অর্থাৎ মিশনারী অভিসন্ধি সম্পর্কে ক্রমশঃ সতর্ক হয়ে উঠছে বাংলার নব্য যুবকেরা। যদিও শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে খৃষ্টান হওয়ার প্রবণতা তখনও প্রবল। 1838 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 18জন তরুণ খৃষ্টান হয়েছে। অসুস্থতার জন্য ডাফ 1834 খৃষ্টাব্দে সাময়িকভাবে দেশে ফিরে যান। 1840 এ আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। সারাজীবনে তিনি অন্তত পঞ্চাশজন শিক্ষিত যুবককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মিশনারী বিরোধিতার মানসিকতা থেকেই গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের 'রিফর্মারে' খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখলেন। সেইসব প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানালেন রস ডোনেলি ম্যাংগলস, কৃষ্ণমোহনের 'এনকোয়ারারে'[5.25]। ডাফ এবং অন্যান্য মৌলবাদী খৃষ্টানদের তৎপরতার প্রতিবাদে চল্লিশের দশকে ব্রাহ্মসমাজ ও তাদের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মিশনারীদের প্রচার অভিযানের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠলো। ব্রাহ্মদের মিশনারী বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও রুখে দাঁড়ালেন মিশনারী অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে। খৃষ্টধর্মকে আক্রমণ করে নানারকম পুস্তিকা প্রকাশ করে তা সুলভে বিক্রী করতে লাগলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' মিশনারী উপদ্রবের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। খৃষ্টধর্ম বিরোধী নানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ পেতে লাগলো। অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের প্রাবল্য রোধ করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ধর্মান্তরিতদের পুনরায় সধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সুরু হলো। গঠিত হলো 'পতিতোদ্ধার সভা।' এইরকম নানা বিরোধিতার দ্বারা শিক্ষিতমনে খৃষ্টধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ন হলো। 1863 খৃষ্টাব্দে মৌলবাদী ডাফের ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে অবসান ঘটলো শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম বিস্তারের প্রয়াস। সমাপন হলো ডিরোজিও-ডাফের যুগলবন্দী।

ডিরোজিও-শিষ্যদেরও বয়স বাড়তে লাগলো। তাঁদের জীবনে সংগৃহীত

হতে লাগলো নতুন নতুন তথ্য। নতুন নতুন তথ্য থেকে নতুন নতুন উপলব্ধি। তাঁদের মুখ থেকে হিন্দুধর্ম নিপাতের স্লোগান আর শোনা গেল না। তাঁরা মাতলেন রাজনীতিতে। কিশোর বয়সে ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা ইউরোপীয়দের ডেকে এনে ভারতভূমিতে বসত করতে দিতে চেয়েছিলেন। সেই ইউরোপীয়দের নানা ছিদ্র তাঁরা এখন দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে সুরু করলেন বিদেশী শাসকদের অধীনে তাঁদের বাস্তব অবস্থাটা। 1843 খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হলে 'সাধারণ জ্ঞানার্জিকা সভার' এক প্রবন্ধপাঠের আসরে দক্ষিণারঞ্জন মফঃস্বল কোর্টে সীমাহীন দুর্নীতির কথা বললেন। অভিযোগ করলেন, সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথা কাগজেই থেকে গেছে। আসরে শ্রোতা ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন। প্রবন্ধ শুনে উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, কলেজের হলকে বিদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত হতে দেবেন না। রির্চাডসনের এই অশোভন ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ওই 1843 খৃষ্টাব্দেই ডিরোজিও-শিষ্যরা স্থাপন করলেন 'বেঙ্গল বৃটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক একটি রাজনৈতিক সভা। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল রাজদ্রোহী না হয়েও বৃটীশ আইন কানুন মান্য করে দেশের মঙ্গলের চেষ্টা করা। এর আগে বঙ্গদেশের জমিদাররা একত্রিত হয়ে নিজেদের স্বার্থে 'ভূমধ্যকারী সভা' বলে একটি সভা করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে দুটি সভা একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হলো 'বৃটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। এই সমিতির ছত্রতলে মিলিত হলেন রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী ও একদা উগ্রপন্থী ডিরোজিও-শিষ্যগণ। 'বৃটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' মাধ্যমে তাঁরা যে রাজনীতি করলেন তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আবেদন নিবেদনের রাজনীতি। কারণ বৃটীশ শাসনে সর্বাংশে সন্তুষ্ট হতে না পারলেও তার কোনও বিকল্প আছে বলেও তাঁরা মনে করতে পারতেন না। পূর্ববর্তী তুর্কী শাসন তখনও শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের কাছে দুঃস্বপ্ন ছিল।

আর তাদের নাস্তিকতা? হিন্দু বিদ্বেষ? রাধানাথ শিকদার ছাড়া তাঁরা প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে আস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ হয়েছিলেন ব্রাহ্ম, কেউ একেশ্বরবাদী 'ডিয়িষ্ট' কেউ বা ফিরে গিয়েছিলেন সনাতন ধর্মের কোলে। আস্তিক হয়েই তাঁরা থামলেন না। কেউ কেউ আবার কুসংস্কার গ্রস্তও হয়ে গেলেন। প্যারিচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেব 1860 খৃষ্টাব্দের পর প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনাতে নিষ্ফল সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যায় প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে টিকি রেখে পরম ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। রামগোপাল ঘোষ শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দুত্বের মধ্যে। তাঁর বাগাটির বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হতো। মায়ের শ্রাদ্ধও তিনি নিষ্ঠবান

হিন্দুর মত করেছিলেন। রসিককৃষ্ণ প্রতিমা-পূজা সমর্থন না করলেও পরবর্তী জীবনে হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি জানিয়েছিলেন, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে নতুন কোনও ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। যে মাধব চন্দ্রের হিন্দু বিদ্বেষ ছিল পর্বত প্রমাণ সেই মাধবচন্দ্র পরিণত বয়সে বাড়ীতে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করতেন। 'যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম' রামতনুর আবার 'ব্রাহ্মণ পাচক' ছাড়া চলতো না। মেয়ের বিয়ে তিনি জাত মিলিয়ে দিতে ভোলেন নি।[5.26]

চিরজীবনের মত নাস্তিক থেকে গিয়েছিলেন শুধু রাধানাথ শিকদার। কিশোর বয়সে তাঁর ধারণা হয়েছিল দিনে একসের করে গোমাংস না খাওয়ার জন্যই বঙ্গসন্তানদের যাবতীয় দুর্গতি। তাই এ বেলা অর্ধসের ও বেলা অর্ধসের গোমাংস খাওয়ার মধ্যেই জীবনের সিদ্ধি জ্ঞান করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত গোমাংস খেয়ে যেতেন অঙ্কবিজ্ঞানী ভদ্রলোক। সারাজীবন তাঁর এই প্রত্যয় নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ধারণার দাস। সারা জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, নানা তথ্য তাঁকে অন্য কিছু উপলব্ধি করাতে সমর্থ হয়নি। ফলে বৃদ্ধ বয়সে দুরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে পাচক রেখে ডাল ভাতের ব্যবস্থা করতে হয় তাঁকে। তাঁর সারা জীবনের নাস্তিকতাও সেই কৈশোরের স্লোগানের দাস হওয়া ছাড়া কিছুই নয়। এটা নিছক একগুঁয়েমী; এর মধ্যে যুক্তিবাদ খোঁজা বৃথা। যুক্তিবাদ মানুষকে সচল রাখে। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা মানুষের দিক পরিবর্তন করে নিয়ে যায় কৈশোর থেকে বার্ধক্যে। সদ্য গোঁফ ও কিশোর আর পক্ককেশ বৃদ্ধ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না। কিন্তু রাধানাথ শিকদার সারাজীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ডিরোজিও শিষ্যরা পরবর্তীকালে অনেক কিছুই করেছেন। কিন্তু গুরুর জীবনী কেউ লেখেন নি; গুরুর কবিতা নিয়েও মাথা ঘামাননি। গুরুর জীবনী প্রথম লিখেছিলেন একজন ইংরেজ, টমাস এডওয়ার্ডস! তাও ডিরোজিওর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরেরও পরে।

তবে কি হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক ইউরেশীয় যুবক ভারতের মাটিতে যুক্তিবাদীর ছদ্মবেশে শুধুমাত্র খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন? তাঁর দ্বারা শুধুমাত্র অপকৃতই হয়েছে বঙ্গসমাজ?

নিজের শ্রেণী-স্বার্থেই ডিরোজিও খৃষ্টধর্মের প্রসার চেয়েছিলেন এই দেশে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, ডিরোজিওর ছিল খৃষ্টান-সুলভ নৈতিকতাবোধ। তিনি ভণ্ড, লম্পট বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের'

পাতায় ম্যাকনাটনের কুৎসা করার মূলেও ছিল দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা।

তাই দেখা যায় সেদিনের দুর্নীতিগ্রস্ত বঙ্গসমাজে ডিরোজিও-শিষ্যরা মূর্তিমান সততা হয়ে সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে থেকে সুনামের সঙ্গে সরকারী চাকরী করে যাচ্ছেন। রাধানাথ শিকদার দুঃস্থ কুলীদের বেগার খাটানোর জন্য দেরাদুনের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিবাদ করছেন। ফলে সরকারী কর্মে বাধাদানের অভিযোগে আদালতের বিচারে জরিমানাও দিতে হচ্ছে তাঁকে।

ডিরোজিও যদি কয়েক বছর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা না করতেন, তাহলে কী ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গজাগরণ পিছিয়ে যেত? অবশ্যই নয়। ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় চিন্তাধারা বঙ্গসমাজে প্রবেশলাভ করেছিল ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই। ইউরোপীয় জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে বিচার করতে সুরু করেছিল বঙ্গসন্তানেরা। ডিরোজিও নিজের হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন কয়েকজন প্রতিভাবান কিশোরকে। ডিরোজিও না থাকলেও পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে সেই সব ছাত্ররা নিজেদের দাগ রেখে যেতেনই বঙ্গসমাজে। হয়তো আরও গভীর ভাবেই।

ডিরোজিও-শিষ্যরা ইউরোপীয় সভ্যতার আপাদমস্তক গলাধকরণ করে স্বধর্ম ও ঐতিহ্য বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ডিরোজিও শিষ্যদের কার্যকলাপ ও মৌলবাদী ডাফের তৎপরতা বঙ্গসন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একদা। আর ইংরেজী শিক্ষাই তো বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-তিলকের উদ্ভাস ঘটিয়ে সৃষ্টি করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জাগরণ!

ডিরোজিও শিষ্যদের ব্যর্থতা নিয়ে বহুজনে আলোচনা করেছেন। নানা বিদেশী মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন যাবতীয় তথ্য। কিন্তু কোনও বিদেশী মতবাদের প্রয়োজন করেনা, যদি আমরা বিবেচনা করি যে নিজেদের ভিত্তিভূমিকে ভালভাবে না জেনেই, না সুদৃঢ় করেই তাঁরা উচ্চলম্ফণ দিতে চেয়েছিলেন। নরম ভিত্তিভূমিতে উচ্চলম্ফণ হয়না। তাঁরা ছিলেন ছিন্নমূল। তাঁদের সম্বন্ধে সমকালীন কবি ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা ঃ

সোনার বাঙ্গাল করে কাঙ্গাল
ইয়ং বাঙ্গাল যত জনা
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে
কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা
এরা না 'হিঁন্দু না 'মোছলমান'
ধর্মাধর্মের ধার ধারেনা।
নয় 'মগ' 'ফিরিঙ্গি' বিষম ধিঙ্গী

ভিতর বাহির যায়না জানা।
ঘরে ঢোঁকি কুলীন হয়ে
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে
আপন হাতে কেটে খানা।

এছাড়া সেমীয় একেশ্বরবাদীদের পৌত্তলিকতা বিরোধী প্রচার গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে শিক্ষিত বঙ্গসন্তানদের তাড়না করে বেড়িয়েছে। রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র—বঙ্গসমাজের উজ্জ্বল জোতিষ্কদের কেউই এ মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কিন্তু এই মানসিকতার তাঁদের দেশের আপামর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নই করেছে মাত্র। পৌত্তলিকতার অপবাদ ডিরোজিও-শিষ্যদেরও তাড়না করেছিল।

রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ থেকে বঙ্গসমাজ এখন বহুদূরে। কিন্তু একেশ্বরবাদ এখন আর বঙ্গসন্তানদের তাড়না করে বেড়ায় না। ব্রাহ্মরাও প্রায় বিলীন। ডেভিড হেয়ারেরমত বিশুদ্ধ নাস্তিকদেরও চোখে পড়েনা। কেবল কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক নাস্তিকতার আশ্রয় নেয় অপকর্মের সমর্থনে। একদা ঘৃণিত পৌত্তলিকতাই এখন সদর্পে বিরাজ করছে দেশজুড়ে। কারণ পৌত্তলিকতাই আপামর জনসাধারণের কাছে হৃদয়গ্রাহ্য, লোককান্ত, স্বাভাবিক ও আনন্দময়।

এতো কিছু বলার পরেও দুজন ডিরোজিও-শিষ্যের কথা আলাদাভাবে বলতে হয়—একজন রামগোপাল ঘোষ ও অন্যজন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামগোপাল ডিবোজিওর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বিদ্রোহী হলেও কোনওদিন মাত্রা হারাননি। তাঁর পিতামহর মৃত্যু হলে হিন্দুসমাজের লোকেরা তাঁর গোমাংস ভক্ষণের জন্য পিতা গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পারলৌকিক কর্মে অসহযোগিতা করতে থাকেন। ফলে বিপন্ন গোবিন্দ ঘোষ পুত্রকে 'হিন্দুধর্ম বিরোধী কিছু করেননি' এই মর্মে ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করেন। পিতার এই অসহায় অনুরোধে বিচলিত রামগোপাল কাঁদতে থাকেন, কিন্তু 'মিথ্যা কথা' বলতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনাই রামগোপাল ঘোষের চরিত্রের সম্যক পরিচয়। একদিকে তিনি ডিরোজিও উপদিষ্ট 'সত্যের' সেবক। অন্যদিকে পিতার অসহায় অবস্থা তাঁর বিবেককে পীড়ন করছে, তিনি কাঁদছেন। পরবর্তী কালের রামগোপাল আক্ষরিক সত্যের চেয়ে বিবেককেই বেশী সায় দিয়েছিলেন। বাড়ীর পরিজনদের ধর্মবিশ্বাসকে তুষ্ট করতে তিনি দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্যবসা করতেন। অন্যান্য

ডিরোজিও শিষ্যদের মত সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেননি। ব্যবসায়ে লাভ করা অর্থ জনহিতে ব্যয় করতেন। প্রথম বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেছিলেন। আর করতেন রাজনীতি। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করার জন্য সেকালে তাঁর নাম হয়েছিল 'ভারতের ডিমস্থিনিস।' 1844-50 খৃষ্টাব্দে ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিবাদগুলি কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতে বিচারের প্রস্তাব হওয়াতে ইউরোপীয়গণ বিলটিকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' নামে অভিহিত করে তা বাতিলের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। ভারতীয়দের পক্ষে 'সাদা কানুন' ওই বিলটিকে কার্যকর করার জন্য রামগোপাল লেখনী ধারণ করেন। ফলে তিনি এগ্রি-হটিকালচারাল সোসাইটির সভাপতির পদ হারান কলকাতার ইউরোপীয়দের বিরোধিতায়। 1864 খৃষ্টাব্দে কলকাতা পৌরসভা গঙ্গাদূষণের অভিযোগ নিমতলা শ্মশানটিকে গঙ্গাতীর থেকে দূরে সরাতে মনস্থ করেন। প্রতিবাদে হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে আন্দোলন সুরু করেন রামগোপাল। মুখ্যতঃ তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতাতেই পৌরসভা তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে। যে ডিরোজিও শিষ্য একদা হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করে দেশের তৃণ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সেই জনই পরিণত বয়সে হিন্দুজনতার আবেগ তুলে ধরলেন আন্দোলনের মধ্যে।

এবার আসা যাক কৃষ্ণমোহনের প্রসঙ্গে। তরুণ বয়সে ডিরোজিও-গ্রস্ত হয়ে পরিস্থিতির ফেরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে কালাপাহাড়ের মতই আচরণ করেন এই প্রতিভাবান বঙ্গসন্তান। পরিণত হন ছেলেধরা মিশনারীতে। 1833 খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান করার মানসে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রকে চুরিও করেন তিনি। নিজে পাদ্রীর পেশা গ্রহণ করেন বেশ কিছু বছরের জন্য। কিন্তু এই কৃষ্ণমোহনই 1832 খৃষ্টাব্দে পাদ্রীর পেশা ছেড়ে দিয়ে বিশপ্‌স কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোনিবেশ করেন গভীর অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায়। 1857 খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষ্ণমোহন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে কর্মে। বস্তুতঃ পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ইতিহাসে কৃষ্ণমোহন এক অপরিহার্য চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণে, পরীক্ষা পরিচালনায় ও সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়।

প্রথম জীবনে যে কৃষ্ণমোহন হিন্দুধর্মের আপাদমস্তক বিসর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন, সেই কৃষ্ণমোহন বৃদ্ধ বয়সে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত এবং বেদ নিয়ে আলোচনা করছেন Dialogues On the Hindu Philosophy গ্রন্থে। বেদ ও বাইবেলকে সংমিশ্রিত করে লিখছেন Arian witness নামক গ্রন্থ। যদিও একজন খৃষ্টানের দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি আলোচনা করেছেন ভারতের সনাতন ধর্মসাহিত্য, তবুও এ যেন বিপথগামী পুত্রের পিতার কাছে ফিরে আসার প্রচেষ্টা! □□□